আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা
১৬-৩০ জুন ২০২০ ১-১৫ আষাঢ় ১৪২৭

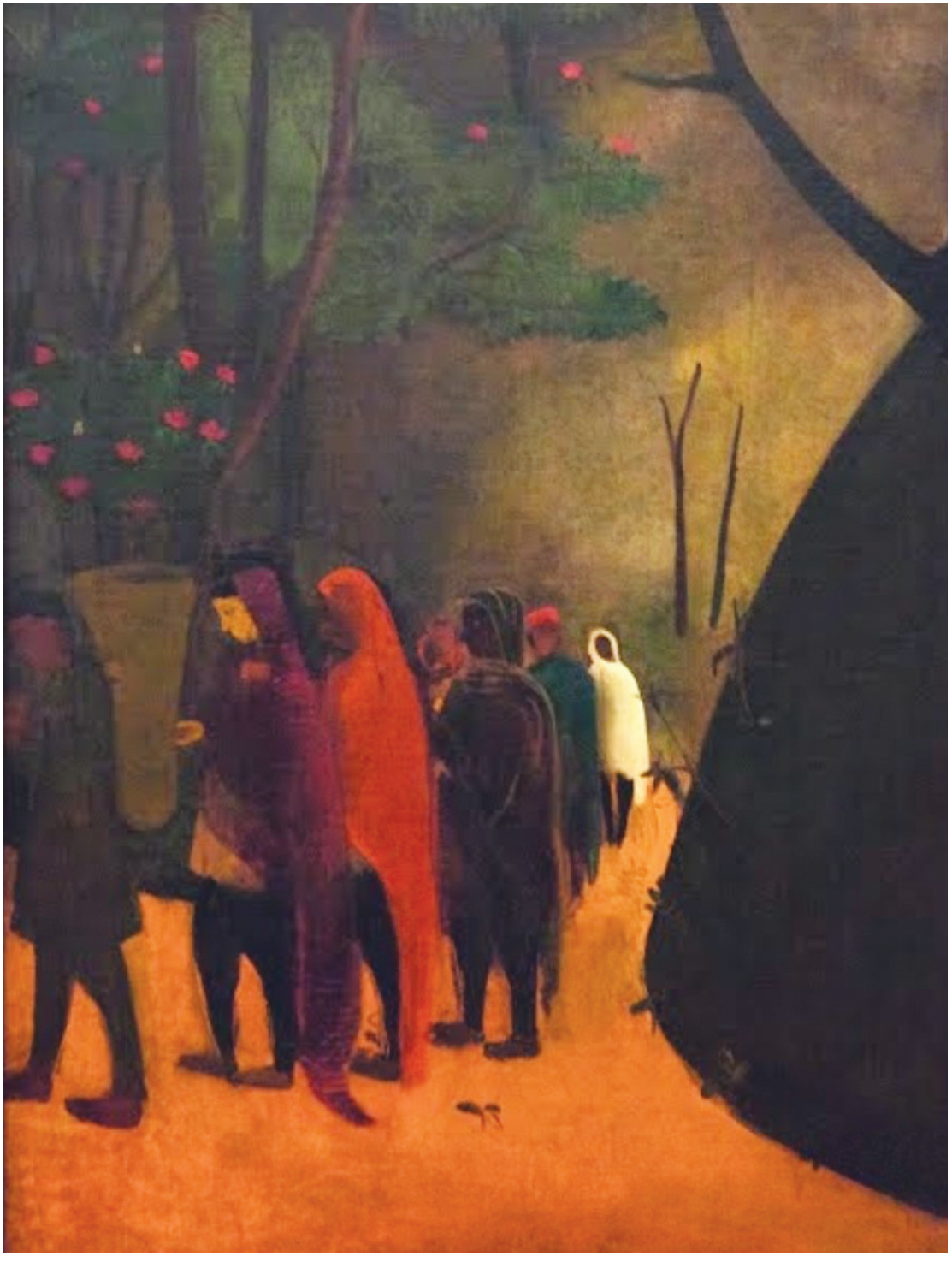

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা
এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা ১৬-৩০ জুন ২০২০,
১-১৫ আষাঢ় ১৪২৭
Vol. 8, Issue 7th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: অমৃতা শেরগিল

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা

বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়
ব্যর্থ লকডাউন ৫
এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়? ৮

সমসাময়িক
সুবিধাবাদ নয়, গণ-বিক্ষোভ ১১
সিইএসসি-র ব্যর্থতা ১৩
নিভৃতবাসে শিক্ষা ১৫

কোভিডের টিকা: অনুসন্ধান, সম্ভাবনা ও প্রগতি
স্বপন ভট্টাচার্য ১৭

সামাজিক দূরত্ব অথবা সামাজিক সঙ্কট
অমিতাভ রায় ২১

মার্কিন বিক্ষোভের নেপথ্যে
শৌভিক চক্রবর্তী ২৬

সাদা-কালোয় মুখোমুখি দুই আমেরিকা
শান্তনু দে ৩০

নিউ ইয়র্কে নিভৃতবাসে
সাগ্নিক দাস ৩৪

বাংলার উন্নয়ণের মিথ
সুখবিলাস বর্মা ৩৮

উন্নয়নের নব নির্মাণ
কবিতা রায়চৌধুরী ৪১

হে হে হে হেঁ হেঁ হেঁ
ইমানুল হক ৪৪

বাবার চিঠি
শমিতা বসু ৪৫

পুনঃপাঠ
সিয়াহ্ হাশিয়ে
সআদাত হাসান মান্টো ৫৫

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা
দুই বছর : ৫০০ টাকা
তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ, উৎসা পট্টনায়ক, বি. রঘুনন্দন
সি. পি. চন্দ্রশেখর, জয়তী ঘোষ, বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট
নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয় ১

ব্যর্থ লকডাউন

লকডাউন। এক নতুন শব্দ যার অস্তিত্ব তিন মাস আগে জানা না থাকলেও, এখন আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। ২৫ মার্চ থেকে গোটা দেশে লকডাউন, সব বন্ধ। এমতাবস্থায় *আরেক রকম* পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রত্যেক মাসের ১ ও ১৬ তারিখ নিয়ম করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি আমাদের প্রত্যয়কে হার মানাল। তিন মাস *আরেক রকম* প্রকাশ করতে আমরা ব্যর্থ হলাম। ১০০ বছরে এহেন অতিমারি গোটা বিশ্ব দেখেনি, সমস্ত দেশকে কখনও অবরুদ্ধ করা হয়নি। এই অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্ব ঘটনা প্রবাহের মধ্যে পাঠকদের হাতে আমরা *আরেক রকম* তুলে দিতে পারিনি। এই খেদ ভোলবার নয়। এখনও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। লকডাউনের মধ্যেই কিছু বন্ধুর সাহায্যে আমরা *আরেক রকম*-এর ওয়েবসাইট তৈরি করতে পেরেছি। আপাতত *আরেক রকম* এই ওয়েবসাইটেই প্রকাশিত হবে। আশা করব, আমাদের পাঠকেরা আগের মতোই আমাদের পাশে থাকবেন।

আরেক রকম-এর সমস্যা নিয়ে আমাদের ভাবনাকে বহুগুণ ছাপিয়ে গেছে দেশের অবস্থা নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনা। আজ এই সম্পাদকীয় পড়তে পড়তে মনে মনে ভাবুন বিগত তিন মাসে আমাদের দেশের উপর দিয়ে কী দুর্যোগ গেছে! বিনা প্রস্তুতিতে, বিনা নোটিশে, হঠাৎ করে গোটা দেশ বন্ধ করে দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। করোনার প্রকোপ থেকে বাঁচতে নাকি যা জরুরি ছিল। আজ আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? যখন লকডাউন শুরু হয়েছিল গোটা ভারতে মোট করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৫০০-র কাছাকাছি। তিন মাস বিভিন্ন পর্যায়ের লকডাউন চলেছে। কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা কমানো যায়নি। বরং ভারত এখন কোভিড আক্রান্তের নিরিখে বিশ্বের চার নম্বর দেশ যেখানে ৩ লক্ষের বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে এবং ৯০০০ এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই পরিসংখ্যান এবং করোনা আক্রান্তের প্রবণতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথমেই তাকানো যাক বিশ্বের প্রথম পাঁচটি করোনা আক্রান্ত দেশের তালিকার দিকে— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত এবং ব্রিটেন। এই পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর মিল আছে। প্রত্যেকটি দেশেই ক্ষমতাসীন রয়েছেন উগ্র দক্ষিণপন্থী একনায়কতন্ত্র প্রেমী ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত, এই দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের উপর নয় ভরসা রেখেছেন নানা অপবিজ্ঞানে। যেমন আমেরিকার ট্রাম্প, ব্রাজিলের বলসোনারো মনে করতেন যে করোনা কোনো অসুখই নয়, নিছক জ্বর বা ফ্লু। তাই কোনো ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেননি শুরুতে। লকডাউন হোক বা অন্যান্য বিধিনিষেধ, কিছুই নয়। জনতা দেদার ঘুরে বেড়িয়েছে অসুখ ছড়াতে থেকেছে। শুধু আমেরিকায় ২১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত, মৃত ১ লক্ষ ১৭ হাজার, ব্রাজিলে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার এবং ৪১ হাজার। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিনও সমগোত্রীয় চিন্তাধারা নিয়ে চলেছেন। ফল মিলেছে হাতেনাতে, পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ সেখানে আক্রান্ত। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন সংক্রমণ বাড়তে দিয়ে মানুষের মধ্যে গণ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (Herd Immunity) তৈরি করবেন। নিজেই আক্রান্ত হয়ে আইসিইউ ঘুরে এসে বুঝেছেন রোগের তীব্রতা। এর পরে নানান কর্মসূচির মাধ্যমে রোগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন।

ভারতের গল্পটি কিঞ্চিত ভিন্ন। এই দেশের প্রধানমন্ত্রী কাজে নয় চমকে বিশ্বাসী। শুরুতেই লকডাউন ঘোষণা করে দিলেন। বললেন যে ২১ দিন নাকি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কয়েকটি ২১দিন পেরিয়ে আমরা ৯০ দিনের লকডাউনের মধ্যে রয়েছি কিন্তু সংক্রমণ এবং মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কেন? কারণ ভাইরাস লকডাউন মানে না। লকডাউনের সঙ্গে এলাকা চিহ্নিত করে ব্যাপক পরীক্ষা করা, রোগীদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা, রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের নিভৃতবাসে রাখা, কিছুই করা হয়নি। বিদেশ থেকে জীবাণু নিয়ে অনাবাসী ভারতীয়রা এয়ারপোর্টে নেমে বাড়ি চলে গেলেন, সরকার কিছু করল না। কোনো নতুন হাসপাতাল, পিপিই কিট, মাস্ক ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত করেনি। পরিবর্তে থালি বাজাও, তালি বাজাও, দিয়া জ্বালাওয়ের মতন কিছু অবৈজ্ঞানিক অন্তঃসারশূন্য কর্মসূচি পালনের জন্য দেশবাসীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অশিক্ষিত ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, ধনী অথচ অবৈজ্ঞানিক ভারতবাসী এইসব নিদান মেনে মোদী মোদী মালা জপেছেন, অন্যদিকে সংক্রমণ প্রবলভাবে বাড়তে থেকেছে। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ জিডিপি-র ১ শতাংশ, নতুন করে মাত্র ১৫০০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে সরকার দায় সেরেছে। ভাইরাসের বিচরণক্ষেত্র উন্মুক্ত। মানুষ রোগে আক্রান্ত হতে থেকেছে।

একদিকে যেখানে করোনাকে কবলে আনা গেল না, অন্যদিকে লকডাউনের তীব্রতার ফলে দেশের অর্থব্যবস্থা ধ্বসে গেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের সলিল সমাধি ঘটেছে। বেকারত্বের হার সমস্ত রেকর্ড চূর্ণ করে বর্তমানে ২৩ শতাংশ। কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এপ্রিল মাসে শিল্পের বৃদ্ধিতে ধ্বস নেমেছে। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে শিল্প উৎপাদন সংকুচিত হয়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কসহ বিভিন্ন সংস্থার হিসেবে ভারতে প্রবল আর্থিক মন্দা দেখা দিতে চলেছে। করোনার প্রকোপে লকডাউন উঠে গেলেও চট করে বৃদ্ধির হার বাড়বে না। কারণ বাজারে ব্যাপক অনিশ্চয়তা রয়েছে। হোটেল, ভ্রমণ, রেস্টুরেন্ট, নির্মাণ শিল্পের মতন ক্ষেত্রে চট করে বৃদ্ধি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিদারুণ কষ্ট আমরা দেখেছি। তাঁরা পায়ে হেঁটে, সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেছেন। বহু মানুষের পথেই মৃত্যু হয়েছে। অনাহার, কর্মহীনতা এবং দুর্বিষহ পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন দেশের শ্রমিকেরা। তবু সরকারের টনক নড়েনি। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনোরকম চেষ্টা সরকারের তরফে দেখা যায়নি। ভারত রাষ্ট্র শ্রমিকদের নিজ দেশেই পরবাসী করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে ভারতের লকডাউন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রোগের সংক্রমণ একদিকে কমেনি, অন্যদিকে অর্থব্যবস্থায় অভূতপূর্ব সংকট নেমে এসেছে।

নির্লজ্জ সরকার এর মধ্যেই মানুষের সঙ্গে স্রেফ বেইমানি করছে। বলা হচ্ছে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ নাকি সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সরকার ঘোষণা করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প যখন বিষ বাঁও জলে তখন মোদী দেশবাসীকে বলছেন আত্মনির্ভর ভারত গড়তে হবে। আমাদের দেশ নাকি এই সংকটের মধ্যেও সুযোগ পেয়েছে নিজেকে বিশ্বদরবারে এক উদাহরণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার, যে কীভাবে করোনার মোকাবিলা করেও অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা রাখা যায়। কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রথমে আসা যাক এই ২০ লক্ষ কোটি টাকার গল্পে। যেকোনো অর্থব্যবস্থা যখন মন্দার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, যেখানে সাধারণ মানুষের আয় কমে গেছে, বেকারত্ব বেড়েছে, বিনিয়োগকারীরা অনিশ্চয়তার বাতাবরণে বিনিয়োগ করতে

ভরসা পাচ্ছেন না, সেখানে সরকারি খরচ বাড়ানো ব্যতিরেকে অর্থব্যবস্থাকে বাঁচানোর অন্য কোনো পথ খোলা নেই। কিন্তু এই ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজের মধ্যে সরকারি খরচ কত? অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন হিসেব দাখিল করেছেন। সমস্ত হিসেবেই দেখা যাচ্ছে যে এই খরচ ২-৩ লক্ষ কোটি টাকার বেশি নয়। অর্থাৎ সরাসরি সরকারি খরচ ধার্য করা হয়েছে জিডিপি-র অধিকতম ১.৫ শতাংশ। তাহলে বাকি টাকার হিসেব কী দাঁড়াল? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদ কমিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে অর্থ বাজারে বাড়তি টাকার জোগান বাড়িয়েছে। এর পরিমাণ ৮ লক্ষ কোটি টাকা, যা আত্মনির্ভর প্যাকেজের মধ্যে ধরা হয়েছে। ছোটো ও মাঝারি শিল্পকে ঋণ দেওয়া হবে, তাও এই প্যাকেজের মধ্যে ধরা আছে। বিভিন্ন রকমের ঋণের হিসেব কষে বলা হচ্ছে যে সরকার অর্থব্যবস্থাকে বাঁচাতে 'স্টিমিউলাস প্যাকেজ' দিচ্ছে। অর্থনীতির প্রথম বর্ষের ছাত্ররাও জানে যে ঋণ কখনও 'স্টিমিউলাস প্যাকেজ'-এর আওতায় আসে না। কারণ ঋণ তখনই পাওয়া যায় যখন আপনি তা চাইবেন। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে বাড়তি ঋণ কেন নেবেন বিনিয়োগকারী বা উপভোগকারীরা? শুধু তাই নয়, আপনি ঋণ নেবেন, আপনি তা ফেরত দেবেন। এর মধ্যে সরকারি কৃতিত্ব কোথায়? তাই ব্যাঙ্কের ঋণকে 'স্টিমিউলাস প্যাকেজ'-এর মধ্যে গণনা করা হয় না, পৃথিবীর কোথাও। সরকারি বাজেটের খরচ আর ব্যাঙ্কের ঋণকে একসঙ্গে জুড়ে আর্থিক প্যাকেজের হিসেব কষা অনেকটা আপেলের সংখ্যা এবং কমলালেবুর সংখ্যাকে জোড়ার মতোই অর্থহীন।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতে সর্বাধিক বিধিনিষেধ সংবলিত লকডাউন ঘোষিত হয়। কিন্তু প্রথম ১৫টি করোনা আক্রান্ত দেশের মধ্যে ভারতের প্রকৃত 'স্টিমিউলাস প্যাকেজ' জিডিপি-র ১-২ শতাংশ, যেখানে আমেরিকায় এই সংখ্যা ১১ শতাংশ, কানাডায় ৯.৮ শতাংশ, ইরানে ৪ শতাংশ, রাশিয়ায় ৩ শতাংশ এবং চীনে ২.৫ শতাংশ। এই নিরিখে বিচার করলে ভারতের লকডাউন নীতি পৃথিবীর নিকৃষ্টতম হিসেবে বিবেচিত হবে। একদিকে, তীব্রতম লকডাউনের পরেও ভারতে সংক্রমণের সংখ্যা পৃথিবীতে চতুর্থতম। অন্যদিকে, অর্থব্যবস্থার 'স্টিমিউলাস প্যাকেজ' সমস্ত দেশগুলির মধ্যে অনেক নীচের সারিতে রয়েছে। অনাহার, বেকারত্ব, অমানবিকতার যে ছবি ভারতে দেখা গেছে তা আর অন্য কোনো দেশে দেখা যায়নি। গোটা পৃথিবীর সামনে আমাদের মাথা নত হয়ে গেছে।

এই চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরেও সরকার তার নিজস্ব এজেন্ডা নিয়ে চলতে বদ্ধপরিকর। শ্রমিক আইন তুলে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে। দেদার বেসরকারিকরণের নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিগুলিকে বেচা হবে, দেশের খনিগুলি তুলে দেওয়া হবে পুঁজিপতিদের হাতে। অন্যের সরকার হাতিয়ে নেওয়ার জন্য বিধায়ক কেনাবেচায় নেমে পড়েছে বিজেপি। চূড়ান্ত সংকটের মধ্যে তার নিরসনের চেষ্টা না করে বিজেপি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নির্বাচনী প্রচারে। আর সমানে চলছে সাম্প্রদায়িক প্রচার, সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করায় কোনো বিরাম নেই। ভারতের ইতিহাসে এমন অপদার্থ, হৃদয়হীন এবং গরিব বিরোধী সরকার এর আগে দেখা যায়নি। ভারতের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে, ভারতের মানুষকে সম্মান নিয়ে বাঁচতে হলে বিজেপি সরকারকে হারাতেই হবে।

কিন্তু বিরোধীরা কি তা করতে প্রস্তুত? এত বড়ো অনাচার অত্যাচার আমাদের দেশে ঘটে গেল। কিন্তু বিরোধী শক্তিরা ফেসবুকে ভাষণ দেওয়া এবং কিছু রিলিফ দেওয়া বাদে বিশেষ কিছু করলেন না। লকডাউনের লজিক মেনে নিয়ে তাঁরাই ঘরবন্দী থাকলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন না, তাদের বিরুদ্ধে ঘটে চলা অত্যাচারের প্রতিবাদে রুটিনমাফিক বিবৃতি জারি করে কর্তব্য সারলেন। বিজেপি সরকার নোট বাতিল, জিএসটি, ব্যর্থ লকডাউনের মতন সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেই চলেছে, মানুষ রোগে, কর্মহীনতায়, অনাহারে সংকটের শেষ সীমায় আগতপ্রায়। তবু বিরোধীরা ঠান্ডা ঘরে বসে আছেন, জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনাচ্ছেন। আন্দোলন তো দূরস্থান সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আখ্যান তৈরি করতে পারছেন না। মানুষ বুঝে গেছেন এমতাবস্থায় বাঁচতে হলে নিজের ভালো নিজেকেই বুঝতে হবে। ভারতের রাজনীতিবিদরা মানুষের পাশে দাঁড়াবে না। অতএব, প্রতিবাদ প্রতিরোধ নয়, হাজার হাজার কিলোমিটার হেঁটে চলাই শ্রেয়, প্রিয়জন হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মৃত হলে ফেসবুকে লেখা বা বুক চাপড়ানো বাদে অন্য কোনো পথ মানুষের সামনে আর নেই। লকডাউনের মধ্যে যেন সমস্ত আশার উপরেই কেউ তালা লাগিয়ে দিয়েছে। সেই তালা খুলতে হলে ঠান্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে বিরোধীদের পথে নামতে হবে। তারা কি তার জন্য প্রস্তুত?

সম্পাদকীয় ২

এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়?

মানুষের সম্মান একটা আশ্চর্য বস্তু, অর্থনীতি অথবা সমাজনীতি দিয়ে পুরোটা মাপা সম্ভব নয়। সংকটকালে মানুষের মুখের উপর ভিক্ষাবস্ত্রের মতো ত্রাণ ছুঁড়ে দিলে তার জীবন হয়তো রক্ষা হয়, কিন্তু সম্মানটুকুর যে লাঞ্ছনা, তার অপরিমেয়তাকে ধরবে কে? এই সম্পাদকীয় পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে হলেও, তাঁদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা, যা ইতিমধ্যেই বহু আলোচিত, সেটুকুর বাইরে আমরা বেশি ভাবিত তাঁদের হৃত সম্মানটুকু নিয়ে। যে সম্মান বর্তমান ভারত সরকারের আমলে ধূলিলাঞ্চিত বললেও কম বলা হয়। তাঁদের আপতকালীন সহায়তার ব্যবস্থা করা গেলেও ভবিষ্যতের সময় বহুকাল মনে রাখবে, কীভাবে সংকটকালে একটা দেশের সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্মান ও সম্ভ্রমকে খোলা বাজারে নগ্ন করে দিয়েছিল।

প্রথম অপমান 'পরিযায়ী' আখ্যাটিতেই। একটা দেশের মধ্যে কোনো শ্রমিক তাঁর নিজের অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র কাজ করতে গেলেও তাঁকে পরিযায়ী বলা হবে, যার ইংরেজি অর্থ মাইগ্রান্ট, এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে তাঁদের সামাজিক অবস্থান রাষ্ট্রব্যবস্থার চোখে কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। লক্ষ্যণীয়, পরিযায়ী শব্দটি কিন্তু মূলত অসংগঠিত দরিদ্র শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। যে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার আধিকারিক কলকাতা ছেড়ে বাঙ্গালোরে গিয়ে থিতু হয়েছেন কর্মসূত্রে, যাকে কর্মসূত্রে আজ কলকাতা কাল কর্ণাটক পরশু হায়দ্রাবাদ করতে হয়, তাঁর ক্ষেত্রে এই উপাধি প্রযোজ্য নয়। শ্রেণি কথা বলে, এবং সবথেকে বেশি বাঙ্ময় সম্ভবত হয়ে ওঠে গরিব মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই। উদারনীতির জমানাতে সমগ্র বিশ্ব নাকি গ্লোবাল ভিলেজে রূপান্তরিত, কিন্তু সেটাও মূলত পুঁজির স্বার্থেই। পুঁজির চলাচল যেখানে অবাধ, শ্রমের চলাচল সেরকম অবাধ হতে গেলেই তার আখ্যা জোটে 'পরিযায়ী'। এরকমভাবে কয়েক কোটি শ্রমিককে নিজভূমে পরবাসী বানিয়ে দেওয়ার উদাহরণ সম্ভবত অন্য দেশে নেই।

দ্বিতীয়ত, ২৫ মার্চের লকডাউনের পর থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি রাষ্ট্রের হাত ঝেড়ে ফেলার মনোভাবটা কীরকম? সম্প্রতি আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা অভিবাসী শ্রমিকদের ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজের মাধ্যমে কিছু তথ্য তুলে এনেছিলেন। শহরে আটকে পড়া ১১,১৫৯ জন অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন। এঁদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ শ্রমিক সরকারি রেশন পাননি, ৭০ শতাংশ শ্রমিক কোনো রান্না করা খাবারও পাননি। ৭৮ শতাংশ শ্রমিকের হাতে ৩০০ টাকার কম অর্থ রয়েছে, ৮৯ শতাংশ শ্রমিক মজুরি পাননি। তাঁদের তথ্যে উঠে এসেছে বাস ড্রাইভার দিল মহম্মদের কাহিনি। যখন সঞ্চয়ের টাকা ফুরিয়ে এসেছে, দিল মহম্মদ লাইন দিয়েছিলেন খাবারের আশায়, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার খাদ্যকেন্দ্রের সামনে। চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াবার পর বিকেলবেলা যখন তাঁর পালা এল, তিনি দেখলেন খাবার ফুরিয়ে গিয়েছে। তাঁর এবং তাঁর দুই সন্তানের ভাগ্যে পড়ে আছে চারটি কলা। অথবা বিহারের আফসানা খাতুনের আখ্যান, যিনি এক বছরের শিশুসন্তান এবং মানসিক অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে হায়দ্রাবাদে আটকা পড়ে আছেন। স্বামীর চিকিৎসার জন্য অতিপ্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে হবে, এদিকে তাঁর হাতে খাবার টাকাও নেই। সরকার সেখানে কী করেছে? তারা প্রথমদিকে শিল্পসংস্থাগুলিকে অনুরোধ করেছিল যেন এই শ্রমিকদের মাইনে দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট সেই অনুরোধ খারিজ করে দিয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালত, যার দায়িত্বের মধ্যে সামাজিক ন্যায় রক্ষাটুকুও নাকি পড়বার কথা, তারাই প্রশ্ন তুলেছে যে কারখানা বন্ধ থাকলে কোন যুক্তিতে শ্রমিকদের মাইনে দিতে বলা যায়? আদালত কোন শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করছে, এই অপ্রিয় প্রশ্নে না গিয়েও এটুকু বলা যায় যে, বিচারপতিরা যদি এই প্রশ্ন করতেন যে সরকারি সিদ্ধান্তে কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকদের মাইনের দায় কে নেবে, তাহলে সহজ উত্তরটুকুও খুঁজে পেতেন হয়তো। দায় নেবে সরকার, কারণ তার সেটাই কাজ। সরকারের কাজ দেশের সম্পত্তি বেচে দিয়ে অবাধ লুটে খাবার বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা করা নয়। দেশের মধ্যে এনআরসি চালু করে বিভাজন সৃষ্টিও নয়। একটি আদর্শ সরকার সেটাই করে যা সামাজিক ন্যায়ের

ধারণার উন্মেষ ঘটায়। যেটা করছে কেরলের সরকার। সরকারের উচিত ছিল এই শ্রমিকদের মাইনে মিটিয়ে দেওয়া। এমনকী ইউরোপের ঘোর পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও সরকারগুলি এটাই করেছে। শুধু সরকারি সংস্থার শ্রমিকদেরই নয়, বেসরকারি বন্ধ সংস্থার শ্রমিকদেরও মাইনে মিটিয়ে দিয়েছে রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতের দক্ষিণপন্থী সরকার আদানি আম্বানীর স্বার্থের প্রতি যতটা দায়বদ্ধ, স্পষ্টতই শ্রমিকের স্বার্থের প্রতি তার কানাকড়ি ভগ্নাংশও নয়। এই অপমানটুকু শ্রমিকেরাও ভালো মতোই বুঝেছেন, আর সেই কারণেই তাঁদের ঘরমুখী যাত্রা।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, তা বলে জাতীয় সড়ক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা বাড়ি ফিরবেন? এত তাড়াই বা কীসের? কিছু দিন পরেই ট্রেন চালু হচ্ছিল, তখনই ফিরতে পারতেন। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা থেকে তাঁদের অনেককেই তো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। তার পরেও কেন তাঁরা এরকম প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ফিরতে গেলেন? এর উত্তর, আবারো, শুধুমাত্র অর্থনীতিতে মিলবে না। আবারো সম্মানের প্রশ্নের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। এঁরা কেউই দানের অথবা দয়ার টাকায় দিন চালাতে চান না। বেশিরভাগ মানুষই চান না। যেটা তাঁদের প্রাপ্য মজুরি, তার দায় সরকার অথবা শিল্পমালিক, কেউ নেয়নি। আদালতও তাঁদের পাশে দাঁড়ায়নি। যে শ্রেণি সামাজিক দায়কে অস্বীকার করেছে, সেই শ্রেণিরই প্রতিনিধিরা এখন দয়ার দান নিয়ে তাঁদের দরজায় এসে হাঁকাহাঁকি করছেন। সেই দান শ্রমিকেরা নেবেন কেন? তাঁদের আত্মসম্মানবোধ কি এতই ঠুনকো? তাই তাঁরা যা থাকে কপালে ভেবে বাড়ির পথে হাঁটা লাগিয়েছেন। সেখানে খাদ্য না থাকুক, অর্থ না থাকুক, মানুষ হিসেবে ন্যূনতম সম্মানটুকু তো আছে! ৮ এপ্রিল ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস জানাচ্ছে, ১৮টি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ২৪ তারিখের নির্মাণ শ্রমিকদের সহায়তা দেওয়ার পরামর্শ মেনে— ১,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত— মোট ১.৮ কোটি শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করেছে। দিল্লি শ্রমিক পিছু দিয়েছে ৫,০০০ টাকা, পাঞ্জাব ও কেরালা দিয়েছে ৩,০০০ টাকা, হিমাচলপ্রদেশ ২,০০০ টাকা, ওড়িশা ১,৫০০ টাকা, উত্তরপ্রদেশ ১,০০০ টাকা। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মতে ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা জমা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৭-২০১৮ সালে নির্মাণ শ্রমিকের সংখ্যা ৫.৩ কোটি। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, এর মধ্যে সাড়ে তিন কোটি নির্মাণ শ্রমিক নথিভুক্ত। এবং একমাত্র নথিভুক্ত শ্রমিকরা এবং যাঁরা তাঁদের নাম নবীকরণ করেছেন তাঁরাই এই সাহায্য পাওয়ার অধিকারী। শুধু তাই নয়, এই টাকা সরকারের নয়, নির্মাণ শ্রমিক বোর্ডের। এই আর্থিক সাহায্য শ্রমিকদের প্রয়োজনের তুলনায় 'তুচ্ছাতিতুচ্ছ' বলে বর্ণনা করে ন্যাশনাল ক্যাম্পেন ফর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কাস-এর কোঅর্ডিনেটর সুভাষ ভাটনগর বলেন, রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তাড়িয়ে দিয়ে এখন আর্থিক ত্রাণের মানে কী? লকডাউনের সঙ্গে সঙ্গেই তো তাঁদের জন্য খাবার আর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দেশান্তরী হওয়ার আগেই দেওয়া উচিত ছিল আর্থিক সহায়তা। ঠিক সেই আর্থিক সহায়তা যখন মেলেনি, এখন এই দয়ার দান শ্রমিকেরা নেবেন কেন?

এই সংকট তাই মহামারীর বা অর্থনীতির সংকট যতটা, ঠিক ততটাই মানবিকতার সংকট। যারা কাজ হারিয়েছেন, সেটাও নিজেদের দোষে না, এক রাত্রের সরকারি সিদ্ধান্তে, তাঁদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেবার মধ্যে যে মহানুভবতা নেই, বরং যেকোনো সাধারণ পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের শর্ত লুকিয়ে আছে, সেই সত্য বিস্মৃত হবার মানে মানবিকতার প্রশ্নটিকেই সংকটের মুখে ফেলা। আর তাই যখন জাতীয় সড়ক ধরে কয়েক হাজার কিলোমিটার হাঁটতে হাঁটতে খিদের জ্বালায় বা গরমের চোটে লুটিয়ে পড়ছেন একের পর এক মানুষ, রেললাইনে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ছেন এবং ট্রেনের চাকার তলায় অসহায়ভাবে প্রাণ দিচ্ছেন, এমনকী নিজ রাজ্যের সীমানায় আসার পরেই যখন তাঁদের মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো দলে দলে নিয়ে গিয়ে ভরে দেওয়া হচ্ছে কোয়ারান্টাইন সেন্টারের মতো অসহনীয় খাঁচায়, যেখানে খাদ্য পানীয় জল বা শৌচাগারের অবর্ণনীয় অবস্থা এতটাই অসহনীয় যে নিয়মিত বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনকে, তারপরেও মানবিকতার এই অভূতপূর্ব সংকট দেখে সরকারের ঘুম ভাঙেনি। তারা তখন মহানন্দে অবাধ বেসরকারিকরণ করতে ব্যস্ত। তারা ইরান, ইতালি, চিন-সহ পৃথিবীর অধিকাংশ করোনা-আক্রান্ত দেশ থেকে ভারতীয়দের বিশেষ বিমানে ফেরাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে আটকে থাকা গুজরাতের তীর্থযাত্রী, কোটা শহরে অবরুদ্ধ ছাত্রদের স্ব-রাজ্যে ফেরাতে বাসের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করতে কাটিয়ে দিয়েছে দেড় মাস সময়। এই ট্রেনের টিকিটের টাকাও সরকার আদায় করেছে শ্রমিকদের পকেট কেটে। এ লজ্জা, মানবিকতার এই অসহনীয় অপমান, আমরা রাখব কোথায়?

আর এই যে ভারতবর্ষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্য এক ভারতবর্ষ, জাতীয় সড়ক ধরে হাঁটতে থাকা ভারতবর্ষ, স্থানীয় আড়কাঠির হাত ধরে সঞ্চিত সর্বস্ব অর্থের বিনিময়ে গোপনে রাজ্যের সীমান্ত পেরোনো ভারতবর্ষ, হাঁটতে হাঁটতে পথের পাশে সন্তান প্রসবিনী ভারতবর্ষ, এই অন্য দেশটিকে আমাদের ভদ্রবিত্ত নাগরিক সমাজ এতদিন জানতই না। এখন খবরের কাগজ পড়ে অথবা টিভির পর্দায় নিয়মিত এই দেশের চেহারা দেখতে দেখতে ভয়ে শিউরে ওঠা নাগরিক সমাজ যদি এই রাষ্ট্রব্যবস্থার ন্যায্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে, যদি এই কয়েক কোটি শ্রমিকের অপমান স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভের রূপ নিয়ে আছড়ে পড়ে দিল্লির ক্ষমতার চৌকাঠে, তাকে কি তখন বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সন্ত্রাসবাদ হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হবে? দাগিয়ে দেওয়া হবে দেশদ্রোহ হিসেবে? অ্যান্টি-ন্যাশনাল হিসেবে? যদি সত্যিই এরকম কোনো বিক্ষোভ হয়, তাহলে সে বিক্ষোভ প্রণম্য। সেই বিক্ষোভের থেকে বড়ো দেশপ্রেম আর কিছুই হতে পারে না। এই সম্পাদকীয় সেই অনাগত আগামীর গণবিক্ষোভের প্রতি দায়বদ্ধ থাকছে।

সমসাময়িক

সুবিধাবাদ নয়, গণ-বিক্ষোভ

চেষ্টা করেও বিজেপি কিছুতেই তার সুবিধেবাদী মুখটা লুকিয়ে রাখতে পারল না। ভয়াবহ করোনা সংক্রমণের আতঙ্কে যখন গোটা দেশ অবরুদ্ধ, লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকেরা পায়ে হেঁটে কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ বাড়ির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন, অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন কর্মহীন মানুষ, তখন মানবিকতার এই অভূতপূর্ব সংকটে বিজেপি কী করছে? অন্যান্য নানা রাজনৈতিক দল সীমিত সামর্থ্যেই কেউ কম কেউ বেশি রিলিফের কাজ করে যাচ্ছে নানা জায়গাতে, কেউ শ্রমজীবী মানুষের রান্নাঘর চালাচ্ছে, কেউ বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে রেশন। মূলত বামপন্থীরাই এই কাজগুলোতে অগ্রণী হলেও সত্যের খাতিরে বলা ভালো যে অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলগুলিও নানারকম কাজ করছে। সেখানে ভারতের বৃহত্তম দলটির ভূমিকা কী? কোনোরকম রিলিফজাতীয় কাজে দেখা গিয়েছে এমন অপবাদ তাদের অতি বড়ো শত্রুও দিতে পারবে না। লকডাউনের শুরুর দিকে তারা ব্যস্ত ছিল করোনা সংক্রমণের জন্য দায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, এমন প্রচারে। তবলিগি জামাতের সম্মেলন নিয়ে হাজার হাজার ভুয়ো খবর ছড়িয়ে গেল তাদের আইটি সেল, যার মূল বিষয়বস্তু হল সংখ্যালঘুরা করোনাকে হাতিয়ার করেছে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে। আর এখন, লকডাউনের অন্তিম পর্যায়ে এসে তারা উঠে পড়ে লেগেছে করোনা বিপর্যয়ের রাজনৈতিক ফায়দা তোলবার জন্য। বিশেষ করে বাংলাতে, করোনা এবং আমফানের জোড়া আঘাতের পর যে বিপর্যস্ত অবস্থা, তাকে পুঁজি করে তারা নেমে পড়েছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে। অমিত শাহের সাম্প্রতিক ভার্চুয়াল সভার বক্তব্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অমিত শাহর বক্তব্যের মূল সুর ছিল বাংলা দখল। তাই একের পর এক প্রকল্পের উল্লেখ করে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, কেন তারা সেই প্রকল্পের টাকা পায়নি। ইঙ্গিত দিয়েছেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলা সেসব প্রকল্পের টাকা পাবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে শ্রমিক স্পেশাল চালাচ্ছে কেন্দ্র। শাহর বক্তব্য যে ওই ট্রেনকে 'করোনা স্পেশাল' বলে কটাক্ষ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এগুলোই তৃণমূল সরকারকে এক্সিট রুট দেখাবে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে বাংলায় নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা কমাতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প লাগু করছে না মমতা সরকার। জানিয়েছেন, মোদী সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের বিরোধিতাই আগামীতে মমতা সরকারের এক্সিট রুট হবে। আর এই কথাগুলো কখন বলছেন তিনি? যখন সাইক্লোন ও করোনার জোড়া ফলাতে গ্রাম বাংলা বিপর্যস্ত। কয়েকশ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। চাষের জমিতে নোনাজল ঢুকে আগামী এক বছরের জন্য কৃষি-অযোগ্য অনুর্বর ডাঙায় পরিণত হয়েছে বহু গ্রাম। তার সঙ্গে প্রতিদিন জমছে করোনাতে মৃত্যুর পাহাড়। কর্মহীন গরিব মানুষ নিরন্ন দিন কাটাচ্ছেন। সেই সময় অমিত শাহ কি এই সমস্যাগুলো নিয়ে কোনো কথা বলেছেন? সমাধান সূত্র না দিন, অন্তত সমবেদনাও জানিয়েছেন কি? তাঁর কোনো কথা থেকে কি এটা মনে হয়েছে তিনি বাংলার মানুষের এই অসহনীয় অবস্থা নিয়ে চিন্তিত? না। একবারের জন্যও এসব বিষয়ের ধারকাছ দিয়ে যাননি শাহ। তিনি শুধু যুদ্ধং দেহি মেজাজে তরবারি শানিয়ে গিয়েছেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে, কারণ সামনে ভোট! দেশের অর্থনীতিতে যখন প্রবল ভাঙন, দরিদ্র মানুষের সহায়তায় একটা পদক্ষেপও যেখানে গ্রহণ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার, এমনকী সাইক্লোন হানার পর বাংলাকে পর্যাপ্ত সাহায্যটুকুও দেয়নি, সেই অবস্থায় অমিত শাহ ন্যূনতম যেটা করতে পারতেন, তা হল তাঁদের দোষত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া। অন্তত লোকদেখানো হলেও। তাতে কাজের কাজ কিছু না হলেও সদিচ্ছার অভাবটা এত তিক্তভাবে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠত না। ক্ষমা করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমা চাওয়াটাও কি এতই কঠিন ছিল?

সেই সঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ। করোনা মোকাবিলায় এই সরকার অসফল, কিন্তু সেটা তবুও ছাড় দেওয়া গেল। অনেক

রাজ্যেই করোনা সংক্রমণ বাড়ছে, এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব পশ্চিমবঙ্গেই একমাত্র হয়েছে এমনটাও নয়। কিন্তু আমফান হানার পর রাজ্য সরকার যেভাবে নিজের অপ্রস্তুত এবং অসতর্ক চেহারা দেখাল, সেটা মানা কঠিন। অন্তত দশ দিন আগে থেকেই আবহাওয়া দপ্তর রাজ্যকে সতর্ক করে আসছিল সাইক্লোনের ব্যাপারে। তার পরেও, সাইক্লোন হানার সাত দিন, কোথাও দশ দিন, এমনকী পনরো দিন পরেও বিদ্যুৎ ফিরল না। গ্রাম এবং শহর সর্বত্র জল ও বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় দিনের পর দিন কাটালেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এতটা অগোছালো অবস্থা কোনো সরকারের হলে তার সুযোগ বিরোধীরা নেবেই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানো নিয়ে টালবাহানা। করোনা নিয়ে তথ্য চাপার অভিযোগ। এবং সর্বোপরি ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি। তৃণমূল কংগ্রেস চুরি করতে করতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে গৃহহীন খাদ্যহীন অসহায় মানুষের ত্রাণসামগ্রীও নিজেদের পকেটস্থ করছে। বহু জায়গা থেকে উঠে আসা এমন অভিযোগ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ঠিক কতটা ঘুণ ধরেছে রাজ্য সরকারের ভিত্তিতে। মানুষ মরছে, সেদিকে চোখ না দিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্র কখনো পারস্পরিক তরজায় ব্যস্ত থাকছে, আর নয়তো চোদ্দ পাতার উত্তরে রাজ্যপালকে বাহান্ন পাতার চিঠি লেখার পেটফাটা কমেডির আমদানি করে সেদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষের। চাপা দিচ্ছে নিজেদের ব্যর্থতার আসল ছবিটা। আগামী ভোটে কে জিতবে, সেই অঙ্কের এখন বিশেষ মানে নেই। দুই দলই চোর এবং অপদার্থ।

এই পরিস্থিতিতে তাহলে বিকল্প কারা হয়ে উঠতে পারেন? উত্তর জানাই ছিল। বামপন্থীরা। বামপন্থী দল এবং আরো বৃহৎ বৃত্ত যাঁরা প্রগতিশীল চিন্তা ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাঁরা রিলিফের কাজ যেভাবে করছেন গোটা রাজ্য জুড়ে, তা নিশ্চিতভাবেই প্রশংসনীয়। এই দুঃসময়ে একমাত্র ইতিবাচক ভূমিকা তাঁরাই নিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বামেরাও শুধু এটুকুতেই থেমে যাচ্ছেন। রিলিফের কাজ তো চলবেই, কিন্তু তার পাশাপাশি মানুষকে সংঘবদ্ধ করা, রাষ্ট্রের উদাসীনতার বিরুদ্ধে গণজমায়েতের কাজটাও বামেদেরই করবার কথা ছিল। এই দ্বিতীয় জায়গাটায় তাঁদের দেখা যাচ্ছে না। নয়তো পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে অন্তত একটা গণবিক্ষোভ আমরা দেখতে পেতাম। কিন্তু আমরা কিছু ফেসবুক লাইভ দেখলাম, বাম নেতৃত্বকে সক্রিয়ভাবে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেল না। মুশকিলটা যেখানে, তা হল রিলিফ দেবার প্রক্রিয়াটির অন্তর্নিহিত সংকট। একদিকে যেমন দুর্যোগের সময়ে রিলিফ না দিলে মানুষের পাশে থাকার কাজটুকু হবে না, আবার শুধু রিলিফ দিয়ে গেলে আসলে শোষক রাষ্ট্রেরই সুবিধা করে দেওয়া হবে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় অ্যাজিটেশন, সেই কাজটুকুতে বামেরা কেন অনীহা দেখাচ্ছেন? রিলিফের কাজে বামেদের এগিয়ে আসতে হচ্ছে কারণ রাষ্ট্র এই কাজ করছে না, রাজ্য সরকারও হাত গুটিয়ে নিয়েছে। সংকটের সময় মানুষের পাশে থেকে রিলিফ দেওয়ার ঐতিহ্য বামেদের বহু পুরোনো। কিন্তু সরকারের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করা, তার বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করা, সেটুকু বামেরা ছাড়া আর কে করবেন? বহু জায়গায় তারা কমিউনিটি কিচেন চালালেন। কিন্তু রেশন ব্যবস্থায় মানুষের অধিকারের প্রশ্নে সেই মানুষগুলিকে সংগঠিত করে স্থানীয় স্তরে সমস্ত মানুষের জন্য সরকারি রেশন দেওয়ার দাবিতে বামেরা মানুষের জমায়েত করতে পারলেন না। আগামী বিধানসভা ভোটে কী হবে সেই কথার জবাব ভবিষ্যত দেবে। কিন্তু বামেদের প্রধান দায়িত্ব মেহনতী মানুষকে সংঘবদ্ধ করে গণ-অসন্তোষ নির্মাণের মাধ্যমে শ্রেণি রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাংলার মানুষ কি সেই শ্রেণি রাজনীতির মুখ দেখবে?

সমসাময়িক

সিইএসসি-র ব্যর্থতা

দিন দশেক আগে থেকেই আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাষ ছিল। সামুদ্রিক ঝড়ের গতিবিধি ও তীব্রতা সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা ছিল। ২০ মে সকাল থেকেই আবহাওয়া দপ্তর ভয়াবহ ঝড়ের প্রায় প্রতি মুহূর্তের অবস্থান সম্পর্কে ধারাবিবরণী সম্প্রচার করতে থাকে। জল-হাওয়ার খবরকে গুরুত্ব দিতে যারা অভ্যস্ত তারা অনেক আগেই আগাম ব্যবস্থা নেয়। মাঝদরিয়া থেকে প্রায় সমস্ত ট্রলার-নৌকা তীরে চলে আসে। গ্রাম-গঞ্জের কাঁচাবাড়ির বাসিন্দারা পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়। দীর্ঘদিন ধরে অবরুদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত মানুষ বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে আসন্ন সামুদ্রিক ঝড়ের আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে সময় কাটাতে শুরু করে। এমন এক বিপদের লগ্নে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হতে থাকে প্রশাসনের অভয়বার্তা, আমরা প্রস্তুত আছি; অযথা সন্ত্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রশাসনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আবেদনও জানানো হয়। পুরসভা, দমকল, বিদ্যুৎ সংস্থা ইত্যাদির তরফেও যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া আছে বলে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করা হচ্ছিল।

তবুও প্রবল ঝঞ্ঝার অভিঘাতে সন্ধ্যার পর থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। ভাঙতে থাকে নদীর বাঁধ। উড়ে গেল বাড়ির চাল। উপড়ে পড়ল প্রাচীন গাছ। ভেঙে পড়ছে বিদ্যুতের খুঁটি। ছিটকে যাচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার। সারারাত ধরে দাপট চালিয়ে ২১ মে সকালে প্রকৃতি শান্ত হওয়ার পর দেখা গেল সমস্ত পরিকাঠামো লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। রাস্তায় পড়ে থাকা গাছের জন্য যানবাহন চলাচল স্তিমিত অথবা ব্যাহত। কাঁচাবাড়ির অস্তিত্ব নেই। নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় আনাজের খেত চলে গেছে জলের তলায়। নোনা জলে ভরে গেছে মাছের ভেরি। বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত। ফলে জল সরবরাহ বন্ধ। সবমিলিয়ে জনজীবন সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। এবং কার্যত দেখা গেল সকলেই ব্যর্থ।

প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে থাকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার সংবাদ। জরুরি পরিষেবার কাজে নিযুক্ত কর্মীবাহিনী দিনরাত এক করে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বাড়িয়ে দেয় সহযোগিতার হাত। ফলে কয়েকদিনের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের অনেকাংশেই পড়ে যাওয়া গাছ সরিয়ে অস্থায়ীভাবে হলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করতে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পুনর্নির্মাণ এত সহজ নয়। সময় লাগবে। অর্থের প্রয়োজন। দরকার প্রশাসনিক দক্ষতা।

কলকাতা এবং তার আশপাশের এলাকার বহু অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নতুন করে শুরু করতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে গেল। কোথাও তিনদিন কোথাও আবার চার-পাঁচ-ছয় দিন। কয়েকটি এলাকা তো ২০ মে থেকে একটানা ন'-দশ দিন নিষ্প্রদীপ ছিল। কলকাতা এবং তার আশপাশের এলাকা মিলিয়ে ৫৬৭ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডের ৩৩ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিইএসসি লিমিটেড পয়লা জুন, ২০২০ খবরের কাগজে বড়ো করে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাল, 'দিবারাত্র কাজ করে আমাদের কর্মীরা রেকর্ড সময়ে ৩৩ লক্ষ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। করোনা অতিমারীর প্রকোপে আমাদের বেশ কিছু পরিযায়ী কর্মী বাড়ি চলে গিয়েছিলেন এবং পরিবহন দুর্যোগে তাঁদের যথাসময়ে কর্মক্ষেত্রে ফেরা সম্ভব হয়নি।...'

অকপট স্বীকারোক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হল বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থায় পরিযায়ী কর্মী কেন নিয়োগ করা হয়েছে? বিদ্যুতের মতো অত্যাবশ্যক একটি পরিষেবা সংস্থায় চুক্তিভিত্তিক বহিরাগত অস্থায়ী কর্মী দিয়ে কাজ চালানো মোটেও সঙ্গত নয়। যে সংস্থা ১৮৯৯-এর ১৭ এপ্রিল থেকে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে চলেছে কেন তাদের বহিরাগতদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে? যে সংস্থা দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ পার করে আরো অনেক দুঃসময়ে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ করে গেছে বহিরাগত অস্থায়ী কর্মীদের অজুহাত দেখিয়ে সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া তাদের মানায় না। সম্ভবত চুক্তিভঙ্গ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে রীতিমতো টেন্ডার করে লন্ডনে নথিভুক্ত 'দি ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি'-কে তখনকার ভারতের রাজধানী কলকাতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সংস্থাই ছিল সিইএসসি-র আদি সংস্করণ। ১৯৪৬-এ সরকারের ইলেকট্রিসিটি ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টরেট স্থাপনের সময়ও সিইএসসি-সহ রাজ্যের যে ২৫টি সংস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ করার অনুমতি পেয়েছিল সেখানেও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আপৎকালীন পরিষেবা প্রদান ইত্যাদি শর্তও ছিল। ১৯৭৮-এ

সংস্থার সদর দপ্তর লন্ডন থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ও কোনো শর্ত পরিবর্তন হয়নি। ১৯৮৯-এ সিইএসসি-র মালিকানা আরপিজি গোষ্ঠীর হাতে চলে গেলে সংস্থার ভারতীয়করণ সম্পূর্ণ হয়। তবে পরিষেবা সংক্রান্ত শর্তাবলীতে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আপৎকালীন পরিষেবা প্রদান ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন স্থায়ী ও দক্ষ কর্মী। সিইএসসি-তে দীর্ঘকাল এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় অবস্থিত ছিল সিইএসসি-র সেন্ট্রাল স্টোর। পাঁচিল ঘেরা বিশাল প্রাঙ্গণে রাখা থাকত বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কেবল, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি। স্থায়ী কর্মীরা সেখানে দিবারাত্র শিফট অনুযায়ী উপস্থিত থাকতেন। যেকোনো বিপর্যয়ের খবর পাওয়া মাত্রই তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে কারিগরি দক্ষতায় পরিস্থিতি সামাল দিতেন।

২০১১-র ১৩ জুলাই আরপি-সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী জন্ম নেওয়ার পর সিইএসসি-র নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে গেল। সিইএসসি হয়ে গেল আরপি-সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর একটি শাখা। একই সঙ্গে বদলে গেল এতদিনকার প্রচলিত রীতিনীতি। সেন্ট্রাল স্টোর উঠিয়ে দিয়ে সেখানে তৈরি হল বিশাল শপিং মল। আর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজকর্ম সামাল দেওয়ার জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হল। স্থায়ী কর্মীদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের পুরো বিষয়টি বহিরাগতদের হাতে তুলে দেওয়ায় আগেকার কর্মদক্ষতা হারিয়ে গেল। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে অল্প পারিশ্রমিক দিয়ে নিয়ে আসা অস্থায়ী কর্মীদের কাছে কলকাতার রাস্তাঘাট গলিঘুঁজি একেবারেই অপরিচিত। ফলে সাধারণ পরিস্থিতিতেই যেকোনো মেরামতির কাজ আগের মতো তড়িৎগতিতে হওয়ার পালা সাঙ্গ হয়ে গেল।

জাতীয় অবরোধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহিরাগত অস্থায়ী কর্মীরা সঙ্গত কারণে প্রথম সুযোগেই নিজের রাজ্যে ফিরে যায়। ফলে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তাঁদের অধিকাংশই কলকাতার কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তার ফলেই সিইএসসি-র গ্রাহকদের এমন ভোগান্তি।

ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী সরকারের কাছ থেকে অনুমতি বা লাইসেন্স নিয়ে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সংস্থা ব্যাবসা করতে পারে। লাইসেন্স-এর শর্তাবলী বেসরকারি সংস্থা মেনে চলছে কিনা তার নজরদারির জন্য রাজ্য সরকারের নিজস্ব দপ্তর আছে। সেন্ট্রাল স্টোর তুলে দেওয়ার বিষয়টি কি সরকারের অজ্ঞাতসারে হয়েছিল? নিশ্চয়ই নয়। কাজেই এখনকার বিপর্যয়ের পরে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সিইএসসি-র সদর দপ্তরে তড়িঘড়ি পদার্পণ কোনো সমাধানের পথ নয়। সিইএসসি-র নিজস্ব স্থায়ী কর্মীবাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল।

১৯৮৩-র জুন মাসে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে সিইএসসি-র কর্মকর্তারা অঙ্গীকার করেছিলেন যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা যথাযথ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। যেমন শহরের মধ্যে সমস্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী তারকে ভূগর্ভস্থ করা হবে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারাও যেন শহরাঞ্চলের জন্য ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (এখনকার বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি) সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ায় সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের সময় বিধাননগরের সমস্যার মাত্রা অনেক কম। পক্ষান্তরে সিইএসসি বড়ো রাস্তা বা অভিজাত এলাকায় ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সংস্থাপন করলেও অধিকাংশ এলাকায় তা হয়নি। বিশেষত যে ৫৬৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকার সম্প্রসারিত জনপদে যেখানে সিইএসসি-র নতুন করে পরিষেবা দেওয়া শুরু করেছে সেখানে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুঁটি পুঁতে পরিবাহী তার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে ঝড়ের প্রবল দাপটে উপড়ে যাওয়া গাছ পরিবাহী তারের উপরে পড়ে সমস্ত ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তখনই প্রশ্ন ওঠে গাছ কে সরাবে? পুরসভা? দমকল? পুলিশ? এহেন পরিস্থিতিতে রাজ্য প্রশাসনের তরফে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ কি দেওয়া হয়েছে?

অবশেষে সেনাবাহিনী ও অন্য রাজ্য থেকে আমন্ত্রিত দক্ষ কর্মীবাহিনী স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় উৎপাটিত হাজার পাঁচেক গাছ সরানোর পর শুরু হয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মেরামতের কাজ। সিইএসসি-র উপর রাজ্য প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাওয়ায় অথবা একেবারে অন্তর্হিত হওয়ার ফলে তেত্রিশ লক্ষ গ্রাহকের এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি। এবং এই ভোগান্তি দেখার পরও রাজ্য প্রশাসন সিইএসসি-র উপর কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে কি? এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়নি।

লোকে বলে কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করছে? যে প্রশাসন সিইএসসি-র বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর আবেদন বারেবারেই নিঃশব্দে মেনে নেয় তারা কী করে সিইএসসি-কে চোখ রাঙাবে? প্রশাসনিক প্রধান রাতবিরেতে সিইএসসি-র সদরে হানা দিয়ে সংবাদের শিরোনাম হতে পারেন, তাতে কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হয় না। করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকার সময়ে আরপি-সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী ও অন্যান্য সমগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন শপিং মল উন্মুক্ত করার নির্দেশ যে প্রশাসনিক প্রধান দিতে পারেন তাঁর পক্ষে আর যাই হোক সিইএসসি-কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কাজেই এই হয়রানির জন্য সিইএসসি-র ব্যর্থতা যেমন দায়ী তার থেকেও অনেক বেশি দায়ী জনবিরোধী এক অযোগ্য রাজ্য প্রশাসন।

সমসাময়িক

নিভৃতবাসে শিক্ষা

করোনা আক্রান্ত ভারতে, সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব রাখার বাধ্যবাধকতায় দেশের ছাত্রসমাজ এক বিরাট অনিশ্চিয়তার সামনে দাঁড়িয়ে। কবে স্কুল-কলেজ খুলবে জানা নেই। কবে পরীক্ষা হবে জানা নেই। অনেকের পরীক্ষা মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন শিক্ষাবর্ষ কবে শুরু হবে, কারা নতুন ক্লাসে যাবে, কীভাবে যাবে এই নিয়ে কর্তৃপক্ষের যে খুব মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মাথা যখন আছে তখন কিছু একটা করতেই হয়। অতএব সব সমস্যার নিরসনের উপায় হিসেবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে 'অনলাইন ক্লাস'।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাস হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের মোবাইল বা ল্যাপটপের সামনে বসে ক্লাস নেবেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের মোবাইল বা ল্যাপটপের সামনে বসে ক্লাস করবে। এর থেকে ভালো ব্যাপার আর কীই-বা হতে পারে! বাড়িতে বসেই রোজ স্কুল-কলেজের ক্লাস হবে, পড়াশোনা হবে, শিক্ষার বহমান ধারা বয়ে চলবে।

ভারতের শহুরে মধ্যবিত্তদের এহেন রোমাঞ্চকর কল্পনার ফানুস যখন উড়তে শুরু করেছে তখন অপ্রিয় হলেও কিছু সত্যি কথা বলাই আমাদের কর্তব্য। অনলাইন ক্লাস করতে হলে, পড়াশোনা করতে হলে কিছু প্রাথমিক শর্তপূরণ হওয়া জরুরি। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক, উভয়ের হাতেই মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার থাকতে হবে, উচ্চগতির ইন্টারনেট কানেকশন চাই, এবং ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ না থাকলে এর কোনোটাই সম্ভব হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশের কত শতাংশ মানুষের কাছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন আছে?

ভারতের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার শিক্ষা সম্পর্কিত ২০১৭-১৮ সালের রিপোর্ট থেকে কিছু তথ্য উঠে আসে। গ্রামীণ ভারতে মাত্র ৪.৪ শতাংশ পরিবারের কম্পিউটার আছে, ইন্টারনেট সংযোগ আছে ১৫ শতাংশ পরিবারের (ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে স্মার্ট ফোনকেও ধরা হয়েছে)। শহরের ক্ষেত্রে কম্পিউটার আছে ২৩.৪ শতাংশ আর ইন্টারনেট সংযোগ আছে ৪২ শতাংশ পরিবারের। অর্থাৎ, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নাগালের বাইরে রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। এক ভারতের মুষ্ঠিতে ধরা রয়েছে অত্যাধুনিক মোবাইল ও কম্পিউটার ইন্টারনেটের সাহায্যে গোটা দুনিয়া, অন্য ভারত এই সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

যেখানে ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে এহেন প্রবল বৈষম্য রয়েছে সেখানে অনলাইন ক্লাসের প্রবর্তন আসলে সমাজের পিছিয়ে পড়া গরিব অংশকে শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে ঠেলে দেবে। ভারত সাধারণভাবেই একটি বৈষম্যমূলক দেশ যেখানে শ্রেণি, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, ইত্যাদির ভিত্তিতে বিবিধরকম বৈষম্য যুগ যুগ ধরে হয়ে চলেছে। কিন্তু ক্লাসঘর বা শ্রেণিকক্ষ এই দেশে সেই বিরল পরিসর যেখানে বৈষম্য নয় সাম্যের বীজ রয়েছে। সমাজে বৈষম্য থাকলেও, শ্রেণিকক্ষে ধনী-গরিব, ব্রাহ্মণ-দলিত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষকের বক্তব্য শুনতে পারে, শিক্ষালাভ করতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য নেই, তা নয়। কিন্তু অন্তত মৌলিকভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য নেই। এখন এই শ্রেণিকক্ষের অন্তর্জলি যাত্রা করে যদি অনলাইন ক্লাসেই একমাত্র শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহলে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ শ্রেণিকক্ষ থেকেও বিতাড়িত হবে। তা যদি হয় দেশের মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। ভারতের সংবিধানের রচয়িতা বাবাসাহেব আম্বেদকরকে জাতের দোহাই দিয়ে শ্রেণিকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হত না। তিনি শ্রেণিকক্ষের বাইরে বসে পড়াশোনা করতেন। আজকের যুগের আম্বেদকরদের আমরা অনলাইন ক্লাসের নামে শ্রেণিকক্ষের বাইরেই বসিয়ে রাখব।

এর মানে এই নয় যে আমরা প্রযুক্তি বিরোধী। এর মানে এও নয় যে আমরা অনলাইন ক্লাসের সর্বৈব বিরোধিতা করছি। আমরা শুধু বলতে চাইছি যে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে পড়াশোনা সামাজিক বৈষম্য বাড়াবে। কিন্তু তাই বলে তো স্কুল-কলেজ যতদিন বন্ধ থাকবে, শিক্ষা বন্ধ করে রাখা যায় না? ঠিকই। তাই এই পরিস্থিতিতে কীভাবে শিক্ষাদান করা যেতে পারে তা নিয়ে গভীর আলোচনা প্রয়োজন। আমরা আমাদের তরফে কিছু বিকল্প তুলে ধরছি।

প্রথমত, যদি সরকার সত্যিই মনে করে যে অনলাইন শিক্ষাই একমাত্র বিকল্প, তাহলে প্রত্যেক শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী যাতে এর সুবিধা নিতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত ইন্টারনেট পরিষেবা এবং কম্পিউটার/মোবাইল ফোন প্রত্যেককে প্রদান করা উচিত। তা নিশ্চয়ই এই পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়। তাহলে বিকল্প ভাবতে হবে। একটি বিকল্প হল স্কুল এবং কলেজের জন্য দুটি টিভি চ্যানেল শুরু করা যেখানে নিয়মিত শিক্ষকরা ক্লাস নেবেন। অবশ্যই দেখতে হবে যাতে প্রত্যেক রাজ্যের স্থানীয় ভাষাতেও

এই ক্লাস হয়। অন্তত সপ্তাহে ২-৩ দিন করে প্রত্যেক শ্রেণির এইভাবে ক্লাস নেওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। কলেজে অনেকগুলি বিভাগ থাকে। তবু সেখানেও অন্তত কিছু জরুরি ক্লাস টিভি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে নেওয়া সম্ভব। এই ক্লাসগুলির সঙ্গে দেশের মুক্ত স্কুল এবং মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পড়াশোনা করার সামগ্রী, নোটস, বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন এবং তার সমাধানসূত্র পৌঁছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শহর এবং গ্রামে শিক্ষিত বেকারদের তালিকা তৈরি করে তাদেরকে সরকার নিযুক্ত করতে পারে গরিব ঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহশিক্ষা দেওয়ার জন্য। দরকারে কম ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সরকারি উদ্যোগে কোচিং সেন্টার চালানো যেতে পারে। একই সঙ্গে ছোটো ছোটো দলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাও একান্ত প্রয়োজন, কারণ শিক্ষক ছাত্র মুখোমুখি সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিরা আরো উন্নত পরামর্শ দিতে পারবেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে সহজ পথ হিসেবে বেছে নেওয়া হল অনলাইন শিক্ষাকে। আসলে এই সহজ পথ অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই কঠিন। কিন্তু তাতে সরকারের বা বেসরকারি স্কুল কলেজের কীই-বা এসে যায়। সমাজের উচ্চ অংশের প্রতিনিধিরা সরকারে থেকে বা না থেকে শুধু যে তাদের স্ব-শ্রেণির কথা ভাববেন, তাতে আর আশ্চর্যের কী? করোনার প্রকোপে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যাতে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত না হয়ে পড়েন, তার উদ্যোগ নেওয়ার রাজনীতি আপাতত বিন্দুমাত্র চোখে পড়ছে না। এটাই দুঃখের।

কোভিডের টিকা: অনুসন্ধান, সম্ভাবনা ও প্রগতি

স্বপন ভট্টাচার্য

মানুষের শরীরকে ভাইরাসঘটিত সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা দিতে আজ পর্যন্ত সতেরটি ভ্যাকসিনের প্রায়োগিক স্বীকৃতি অনুমোদিত হয়েছে। SARS-Cov2 এই তালিকায় নতুন সংযোজন হবে এবং অনতিবিলম্বে হবে এই আশা বিশ্বের আপামর জনসাধারণের। বলার কথা এই যে, সংক্রামিত শরীর রোগ প্রতিরোধের জন্য যদি কেবল এই অর্জিত ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হত, তাহলে বিশ্ব মোটামুটি মনুষ্যবিহীন হত অনুমান করা যায়! আমাদের সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমরা মুখ্যত জন্মগতভাবেই পেয়ে থাকি। আমাদের জিনতন্ত্র এমনভাবে তৈরি যে একের পরে বারোটা শূন্য বসালে যে সংখ্যা দাঁড়াবে অন্ততপক্ষে ততরকম ভিন্ন ভিন্ন অ্যান্টিজেনের মোকাবিলা একটা সুস্থ্য এবং স্বাভাবিক মানবশরীর করতে পারে। সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে রক্তে সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হওয়াতেই এই ক্ষমতার প্রকাশ। এর কয়েকটি পূর্বশর্ত আছে যার মধ্যে প্রধানত দুটি হল অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি। অ্যান্টিজেনের অভিজ্ঞতা না থাকলে অ্যান্টিবডি উৎপাদনকারী কোষগুলি আক্ষরিক অর্থেই 'নাইভ'— অপাপবিদ্ধ, যার নির্গলিতার্থ এই যে, কোনো নির্দিষ্ট জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবার আগে পর্যন্ত শরীর সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে স্বতপ্রোনদিত হয়ে কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি করে ফেলবে না। রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরি করে এক ধরনের শ্বেতকণিকা, যার নাম বি-লিম্ফোসাইট সংক্ষেপে বি-সেল (B-cells)। অপাপবিদ্ধ বি-সেল একবার সংক্রামিত হয়ে অ্যান্টিবডি তৈরির মত পাপ কাজটি করে ফেললে, তার একটা স্মৃতি থেকে যায় শরীরে। এই স্মৃতিবাহক বা মেমোরি বি-সেল (Memory B cells) পরবর্তী যেকোনো সময়ে ওই একই জীবাণুর সংক্রমণে শরীরকে প্রণোদিত করে একের পরে বারো শূন্যের বিচিত্র তূণীর থেকে ঠিক ঠিক এবং বিশেষ অ্যান্টিবডিখানা বার করে তার মোকাবিলা করতে। বুড়ো আঙুল ধর্ম মেনে বলা দরকার যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া (Primary response) অপেক্ষাকৃত বেশি সময়সাপেক্ষ যেহেতু তা প্রথমবারের দেখাশোনা আর পরবর্তী সব মোলাকাতেই (Secondary response) রেসপন্স টাইম কম, অর্থাৎ শরীরের প্রতিক্রিয়া দ্রুততর। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে নেই নভেল করোনাভাইরাস বা SARS-Cov2 চরিত্রে নভেল বা নতুন হবার দরুন তার অ্যান্টিজেনের সঙ্গে এই হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতিটির কোনো সখ্য বা বৈরিতা গড়ে ওঠার সুযোগই ছিল না এই কুড়ি কুড়ির অতিমারির আগে। এবং দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক মোলাকাতের ফলাফল এককথায় ভীতিপ্রদ, ইতিমধ্যেই পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশের চার লাখের উপর মানুষ লোকান্তরিত, সুতরাং দরকার হয়ে পড়েছে শরীরকে এমন একটু জীবাণু-অভিজ্ঞতা প্রদান করার যাতে মানুষের শরীর উপযুক্ত অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারবে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।

শরীরকে এভাবে অনাক্রম্যতা দেওয়ার পদ্ধতি আজকের নয়। ১৭৯৫-তে কাউপক্সের জীবাণু জেমস ফিপস নামক একটি অষ্টমবর্ষীয় বালকের দেহে প্রবেশ করিয়ে এডওয়ার্ড জেনার ভ্যাকসিনেশন পদ্ধতি চালু করবার বহু বহু আগে থেকেই বিষে বিষে বিষক্ষয় করার প্রায়োগিক নিদর্শন পাওয়া যায় চিন, ভারত, আরবদেশ, আফ্রিকা ও তুরস্ক থেকে। কৃত্রিমভাবে প্রণোদিত এই অনাক্রম্যতাকে বলে অপ্রত্যক্ষ বা প্যাসিভ ইমিউনিটি। 'তেমন কোন প্রতিক্রিয়া ছাড়াই' অ্যান্টিজেনিক এক্সপেরিয়েন্স— এই কথাটার মধ্যেই একটা স্ববিরোধ আছে। একই জীবাণুতে একই প্রতিক্রিয়া হবে সমস্ত অনভিজ্ঞ শরীরে সেটাই স্বাভাবিক। টিকাকরণ হল এই প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহতাকে বাইপাস করে শরীরকে অ্যান্টিজেন মোকাবিলায় সমর্থ করার সবচেয়ে কাঙ্খিত উপায়। তার জন্য যা ব্যবহার করা দরকার তা ধর্মে অ্যান্টিজেন কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় নয়। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ রোগের টিকাকরণ গবেষণা এখন এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তার ২০ এপ্রিলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে অন্তত ৭৬টি গবেষণাগারের স্বীকৃত এমন প্রয়াসের কথা

আমাদের জানিয়েছেন, যার অন্তত কয়েকটি থেকে SARS Cov2-এর বিরুদ্ধে আমাদের শরীরে মারাত্মকভাবে প্রতিক্রিয়াহীন উপায়ে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারা উচিত।[১]

আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত বর্ণিত প্রয়াসগুলির মধ্যে সম্ভাবনাময় কয়েকটির হাল হকিকত জেনে নেওয়া, কিন্তু তার আগে দেখে নেওয়া যেতে পারে, একদম নতুন একটা ভ্যাকসিন মানুষের চিকিৎসায় নিয়ে আসার আগে কোন সম্ভাব্য লাল সংকেতগুলির দিকে গবেষকরা নজরে রেখেছেন।

অনুসন্ধানের শর্ত

যে কোনো নতুন টিকা নিয়ে গবেষনায় যে দুটো জিনিস সব সময়েই মাথায় রাখতে হয়— সেফটি, অর্থাৎ নিরাপদে ব্যবহারযোগ্যতা এবং এফিকেসি, মানে কার্যকারিতা। একটা জীবাণুর নখ দাঁত ভাঙা যে সংস্করণটিকে টিকাকরণের কাজে ব্যবহার করা হয় সেটি এই দুই ধর্মের নিরিখে প্রায় সব সময়েই ব্যাস্তানুপাতিক, প্রায় দ্বিফলা ছুরির মতো। সেফটি বাড়াতে গেলে প্রায়ই কার্যকারিতা বিসর্জন দিতে হয়।[২]

রেগুলেটরি নীতি সব সময়েই সেফটির অনুকূলে সুতরাং প্রচুর ক্ষতি হবার ঝুঁকি নিয়েও বাজারে একটা ভ্যাকসিন ছেড়ে দিলাম— এটা হয় না, হবে না। এর পাশাপাশি সংক্রামক ভাইরাস এবং তার পোষকের মধ্যে সম্পর্ক ভ্যাকসিনের সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। জরুরিভাবে বিবেচনার সম্পর্ক দুটি— এক, ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation Period), মানে ভাইরাসের পোষক শরীরে ঢোকা থেকে শুরু করে রোগলক্ষণ প্রকাশিত হবার অন্তর্বর্তী সময়কাল আর দুই, শরীরে তৈরি হওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতার স্থায়িত্বকাল। এই পরিপ্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাসকে নিয়ে সমস্যা এক নয়, একাধিক। আমরা সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে সব মানুষের শরীরে প্রতিক্রিয়া সমান হয় না। কেউ কেউ সম্পূর্ণ অ্যাসিম্পটোমেটিক, কারো কারো ক্ষেত্রে জ্বর, সর্দি, কাশি-ব্যস। প্রায়শই এসব প্রতিক্রিয়া স্বল্পস্থায়ী ইনকিউবেশন পিরিওডের প্রকাশ এবং এসব মানুষের দেহে স্বাভাবিকভাবে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডির পরিমাণ ও স্থায়িত্ব খুব কম। দেখা যাচ্ছে এইরকম একটু আধটু ভুগে ওঠা মানুষজনের দেহে অধিকাংশ সময়েই আদৌ কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে না। তার মানে এদের পরবর্তী যে কোনো সময় আবার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ষোলো আনা এবং তখন যে প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ হবে না তার নিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে, প্রবল সংক্রমণের ক্ষেত্রে, যাদের মধ্যে তীব্র শ্বাসকষ্ট এবং মৃত্যুর ঘটনাগুলো ঘটছে, দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে অ্যান্টিবডির প্রকাশ এবং স্থায়িত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ভ্যাকসিনের কার্যকারিতার একটা তথাকথিত 'ফাইভ ডে রুল' আছে, যা নির্দেশ করে যে টিকা দেবার পাঁচ দিনের মধ্যে এবং সচরাচর এর মিডিয়ান স্তরে মানে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করে অনাক্রম্যতা এনে দিতে পারবে। কঠিন যেটা, সেটা হল একই সাথে শরীরকে স্মৃতি প্রদান করা যাতে পরবর্তী সংক্রমণগুলির প্রতিরোধও শরীর করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কথা বলা যায়। ইনজেকশন দেবার দু দিনের মধ্যে শরীরে অনাক্রম্যতা এসে যায় কিন্তু পরবর্তী সংক্রমণগুলির সময় আগে নেওয়া ভ্যাকসিন মোটামুটি অকেজো-স্মৃতিহীন। করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন পাবার সম্ভাবনা ও কার্যকারিতায় এই রকম দুফলা ছুরির শাসানি একটা নয়, একাধিক। এর মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি হল।[৩]

১। সেফটি সুনিশ্চিত করতে গেলে অ্যান্টিজেন দুর্বল হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাতে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বাড়বে এবং ভ্যাকসিনের কার্যকারিতাও বাড়বে, কিন্তু ভ্যাকসিন নিলাম আর ইমিউন হয়ে গেলাম এটা হওয়া সম্ভব নয়।

২। ইনকিউবেশন পিরিয়ড বাড়লে পরবর্তী সংক্রমণের ক্ষেত্রেও ইমিউনিটি কাজ করার সম্ভাবনাই বেশি কিন্তু এর মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হতেও পারে।

৩। ইনকিউবেশন পিরিয়ড বাড়লে হার্ড ইমিউনিটি (Herd Immunity) গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও বেশি, কিন্তু ওই, তাতে কিঞ্চিৎ ঝুঁকি থেকেই যায়।

এই সমস্ত প্লাস মাইনাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর শতাধিক ল্যাবরেটারিতে কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরির যে চেষ্টা চলছে তা 'বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস' হয়ে উঠতে পারে কিনা তা সময়ই বলবে।

কোভিড ভ্যাকসিন : আর কতদূর

আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, সংক্ষেপে CDC নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী বলতে গেলে বলতে হয় যে একটা ভ্যাকসিন তৈরির প্রয়াসে ছ-খানা স্টেশন অতিক্রম করলে তবেই গন্তব্যে পৌঁছোনো যাবে। এগুলি হল যথাক্রমে অনুসন্ধান, প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, নীতিগত পর্যালোচনা ও অ্যাপ্রুভাল, বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং শেষ ধাপে কোয়ালিটি কন্ট্রোল। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ট্রাম্পের ড্রাম পেটানো কানে আসছে— আড়াই লক্ষ কোভিড ভ্যাকসিন নাকি তাদের রেডি। জানি না কোনো ভ্যাকসিন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পর্যায় পার হয়েছে কি না। জানি না বলছি এই কারণে যে একটা দৌড় চলছে, এবং সবার দৌড় প্রকাশ্য

নয়। চিন থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত কোন ল্যাবরেটারিতে কে কোন পর্যায়ে আছে তা পাশের লোকেও সব সময় জানবে না। তবে যে পর্যায়েই থাকুক না কেন একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কারের সব চেয়ে সময়সাপেক্ষ শক্ত বাধা হল তার রেগুলেটরি গাইডলাইন বা নীতিগত পর্যালোচনা। অনেক তুল্য মূল্য বিচার করে কিছু সাইড এফেক্টকে মান্যতা দিয়ে সার্বজনীন ভালোর বা উপকারের পাল্লা ভারির দিকে হবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া হুট করে হবার কাজ নয়। এমনকি টিকাকরণের সিজনাল এফেক্টও বিবেচ্য হওয়া উচিত। তা করোনা এল তো চার ছয় মাস, সুতরাং কোন দাবিদার ভ্যাকসিন যে কোন ঋতুতে সমান সক্রিয় এবং অহানিকর এবং ছয়-আট মাস পরেও তা কার্যকরী অনাক্রম্যতা দেবে তা বলার সময় এখনও এসেছে কি? তবু যদি আড়াই লাখ ডোজ রেডি হয়ে থাকে তাহলে মনে যে সংশয় উঁকি দেয় তা হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে রাগ করে বেরিয়ে আসাটা একটা অ্যালিবাই নয় তো? আমরা দেখে নিতে পারি তিন দেশে তিনটি সম্ভাবনাময় প্রয়াসের ভিত্তি আর শাঁস কী কী?

চিন

চিনে দু-খানা ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটারিতে সৃষ্ট দুটি ভ্যাকসিন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে আছে। চিনের CanSino Biologics যে সম্ভাব্য টিকাটি নিয়ে অনেক দূর এগিয়েছে তার ট্রায়াল পর্যায়ের নাম 'Ad5-nCoV' এবং এতে যে নরম সরম জীবাণু ব্যবহার করা হয়েছে তা হল অ্যাডেনোভাইরাস (Adenovirus), করোনাভাইরাস নয়। আমরা সবাই হয়তো ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে করোনাভাইরাসের যে অ্যান্টিজেন মানুষের শ্বাসতন্ত্রের কোষগুলোকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তা থাকে তার কাঁটার মতো স্পাইক অংশে। স্পাইক প্রোটিনকে সমীহ করে 'পাওয়ার স্পাইক' বলারও নীতি আছে। সে বস্তু যখন আমাদের শ্বাসতন্ত্রের কোষের গায়ে গড়ে ওঠা নেহাত নিরীহ যৌগ ACE 2 রিসেপটারকে চিনে নিয়ে আঁকড়ে ধরে, গোলমালের সূত্রপাত তখন থেকেই। টিকা তৈরির জন্য অসংক্রামক অ্যাডেনোভাইরাসের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে করোনার পাওয়ার স্পাইক জিন। এর ফলে অ্যাডেনোভাইরাস যখন স্বেচ্ছাগ্রাহীর দেহে স্পাইক প্রোটিন তৈরি করবে, তখন অ্যান্টিবডি উৎপাদনকারী B- লিম্ফোসাইটগুলি প্রণোদিত হয়ে সক্রিয়তা লাভ করবে। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী ১০৮ জন স্বেচ্ছাগ্রাহীর দেহে এই পরীক্ষার ফেজ ওয়ান ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়েছে মার্চ মাসে এবং ৫০০ জন স্বেচ্ছাগ্রাহীকে নিয়ে ফেজ টু পরীক্ষা হয়েছে এপ্রিল মাসে। সব ক্ষেত্রেই ELISA পদ্ধতিতে দেহে অ্যান্টিবডির সঞ্চার, ঘনত্ব, উপস্থিতি এবং স্থায়িত্ব যাচাই করা হচ্ছে যথাক্রমে ২ সপ্তাহ, ৪ সপ্তাহ, ৩ মাস এবং ৬ মাসের সময়ান্তরে। আশার কথা এই যে, মাত্র ২ দিনের মধ্যেই এই ভ্যাকসিন অ্যান্টিবডি উৎপাদনে প্রণোদিত করতে পেরেছে অধিকাংশ স্বেচ্ছাগ্রাহীর দেহকে।[৪]

দ্বিতীয় গবেষণাটির সঙ্গে যুক্ত ৩৪ জন গবেষকের একটি দল যারা যথাক্রমে Sinovac Biotech এবং Peking Union Medical College এর সঙ্গে যুক্ত। তারা সম্ভাব্য ভ্যাকসিনটির নাম দিয়েছেন 'PiCoVacc' এবং এটি তৈরিতে অন্য জীবাণু নয়, নিষ্ক্রিয় করা করোনাভাইরাস জীবাণুই ব্যবহার করা হয়েছে। এঁরা পাঁচটি দেশ, যথাক্রমে চীন, ইতালি সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও স্পেনের কোভিডে আক্রান্ত রোগীদের দেহ থেকে SARS Cov2 জীবাণু সংগ্রহ করেন। লক্ষ্যণীয়ভাবে এই তালিকায় আমেরিকা বা ভারত নেই। যাই হোক, নমুনাগুলির মধ্য থেকে চিনের একটিকে বেছে নেওয়া হয় এবং কৃত্রিম মাধ্যমে তার বৃদ্ধি ঘটানো হয়। তারপর এই জীবাণুর সংক্রমণ ঘটানোর ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে এটিকে অ্যান্টিজেন হিসাবে ব্যবহার করা হল ইঁদুর ও রেসাস বাঁদরের দেহে। সাত দিন অন্তর অন্তর দুই বা তিন বার ইনজেকশন করে এইসব স্তন্যপায়ীর দেহে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি যাচাই করে এঁদের পরীক্ষা এগিয়েছে। এভাবে যে শুধু প্রথম সাতদিনের মধ্যেই অ্যান্টিবডির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে তা নয়, রেসাস বাঁদরদের মধ্যে সক্রিয় করোনাভাইরাস ঢুকিয়ে দেখা গেছে তাদের ফুসফুস সংক্রমণজনিত ক্ষতি ভ্যাকসিন ইনজেকশনের ফলে নগণ্য অথচ কন্ট্রোল হিসেবে ব্যবহৃত বাঁদরগুলো যাদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া হল না অথচ করোনা জীবাণু দেওয়া হল তাদের ফুসফুস সংক্রমণক্ষতয় জর্জরিত। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের এই ফলাফল সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে এবং এটির ভবিষ্যত আশাব্যঞ্জক বলে মনে হবার অবকাশ আছে।[৫]

আমেরিকা

আমেরিকার যে ভ্যাকসিনটি আশা জাগাচ্ছে সেটি Moderna ল্যাবের অবদান এবং এটিও ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের শেষ পর্যায়ে আছে। এটির নাম দেওয়া হয়েছে mRNA 1273 এবং এটি একটি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত ম্যাক্রোমলিকিউলার ভ্যাকসিন। এই ভ্যাকসিন মানুষের কোষে প্রবেশের পর স্পাইক প্রোটিন অ্যান্টিজেন সংশ্লেষ করতে পারবে এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। হয়েওছে তাই, কিন্তু যেহেতু কোষের মধ্যেকার একটা উৎসেচক RNAse সহজেই এই ভ্যাকসিন RNA কে ভেঙে দিয়ে অকেজো করে দিতে পারে, তাই এটিকে শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছে লিপিড ন্যানোপার্টিকলের মধ্যে প্যাক করে। ন্যানোপ্রযুক্তির

ব্যবহারে তৈরি এই অতিসূক্ষ্ম কণাগুলো রক্তে পরিবাহিত হয়ে লিম্ফতন্ত্রের শরিক হয়ে গেলে তা B- লিম্ফোসাইটকে অ্যান্টিবডি তৈরিতে প্রণোদিত করবে এমনটাই নীতিগতভাবে ভেবে নেওয়া হয়েছে। আমেরিকার National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) মার্চ মাসে দু দফা ট্রায়ালের পর যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী স্বেচ্ছাগ্রাহীদের একটি ২৫০ মাইক্রোগ্রামের ডোজ দেবার ২৩ দিন পরে অ্যান্টিবডি মাত্রা উল্লেখযোগ্য। অপর একটি গ্রুপের একই বয়সী গ্রাহকদের ২৫ ও ২৫০ মাইক্রোগ্রামের দুটি ডোজ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রথম প্রয়োগের ৪৩ দিন পরেও অনাক্রম্যতা আশাব্যঞ্জক। এই ভ্যাকসিন এখন ফেজ টু ট্রায়ালে আছে এবং জুলাই মাসে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে বলে মনে হয়। mRNA1273 সিনথেটিক ভ্যাকসিন হবার দরুন এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা অনেক বেশি যেহেতু একই সময়ে নিষ্ক্রিয় ভাইরাস থেকে যে পরিমাণ ভ্যাকসিন বাজারে আসতে পারে তার চাইতে অনেক বেশি হারে সেটি উৎপাদন করা সম্ভব।[৬]

ইংল্যান্ড

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড জেনার ইন্সটিটিউটের প্রফেসর অ্যান্ড্রু পোলার্ডের নেতৃত্বে সার গিলবার্টরা কোভিড ভ্যাকসিনের জন্য সাড়া জাগানো খবর হয়েছিলেন সংক্রমণের শুরুতেই। এঁদের ভ্যাকসিনটির ল্যাবরেটারি নাম 'ChAdOx1' এবং এটিও চিনের প্রথম ভ্যাকসিনটির মতো ভেক্টর বাহিত উপাদান। ভেক্টর হিসাবে এখানে নেওয়া হয়েছে শিম্পাঞ্জির শরীর থকে আহৃত Adenovirus এর RD (Replication Deficient) প্রকরণ। তার মনে এরা শরীরে স্পাইক অ্যান্টিজেন তৈরি করতে পারবে কোষের মধ্যে তেমন সংখ্যাবৃদ্ধি না করেই। মে মাসের ১৫ তারিখে এর প্রাণি-মডেলের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকার NIAID এর অন্তর্গত Hamilton, Montana স্থিত Rocky Mountain Laboratories-এ ছয়টি ভ্যাকসিনপ্রাপ্ত বাঁদরের সঙ্গে তিনটি কন্ট্রোল (ভ্যাকসিন ছাড়াই সংক্রামিত) বাঁদরের তুলনা করে দেখা গেছে টিকাকরণের ফলে তাদের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়াই কেবল নয়, অনাক্রম্যতা অর্জনের দরুন এদের ফুসফুসে SARS Cov2 বাড়তে পারেনি এবং ফুসফুসে সংক্রমণজনিত ক্ষতি বা পচন হয়নি যা কন্ট্রোল জীবগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই ভ্যাকসিনটির বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য বহুজাতিক AstraZeneca ল্যাবের সঙ্গে মৌ সাক্ষরের কাজও সম্পন্ন করেছে।[৭]

যেগুলির কথা বলা হল তার বাইরে, আগেই বলেছি, শতাধিক ল্যাবরেটারিতে কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরির কাজ চলছে। সবার কাজ সরব নয়। সবাই WHO কে অবহিত রাখছে তাও নয়। সুতরাং কোনদিন হয়তো শুনব ভ্যাকসিন এসে গেছে, যেমন মাঝে মাঝেই ট্রাম্পের সুভাসিতাবলি শুনে যাচ্ছি। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল ভ্যাকসিনের সেফটি বা নিরাপত্তা, এফিকেসি বা কার্যকারিতা এবং মেমরি বা স্মৃতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে কিছু একটা বাজারে এসে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর দেখছি না।

তথ্যসূত্র

১। World Health Organization. (April 20, 2020). DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines – 20 April 2020

২। David C. Kaslow (2020). npj Vaccines (2020) 5:42; https://doi.org/10.1038/s41541-020-0193-6

৩। ওই p. 5

৪। Carlson, R. (2020). https://www.precisionvaccinations.com/vaccines/ad5-ncov-covid-19-vaccine

৫। Qiang Gao, Linlin Bao, Haiyan Mao et al. (2020). Science. DOI: 10.1126/science.abc1932

৬। ক্রমিক সংখ্যা ৪ দ্রষ্টব্য।

৭। N van Doremalen *et al* (2020) https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.093195v1

সামাজিক দূরত্ব অথবা সামাজিক সঙ্কট

অমিতাভ রায়

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস লিখেছিলেন 'লাভ ইন দা টাইম অফ কলেরা'। অজানা অণুজীবের আচমকা আক্রমণে অবরুদ্ধ বিশ্ব নিয়ে হয়তো আগামী দিনে রচিত হবে 'করোনা দিনের আতঙ্ক'। লালমোহন গাঙ্গুলির মতো কোনো সাহিত্যিক 'করোনাকালের কেলেঙ্কারি' লিখলেও লিখে ফেলতে পারেন। তবে ঘরবন্দি অবস্থায় অনেকেই করোনা নিয়ে অনবরত বিস্তর আলোচনা করে চলেছেন। করোনা-র উৎপত্তি, বিস্তার, উপসর্গ, প্রাদুর্ভাব প্রতিহত করার সম্ভাবনা প্রতিবিধান ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর কূটকচালি চলছে। বিভিন্ন মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত পরিসরে চলছে নানারকমের নিরন্তর কচকচানি।

করোনা পর্ব থেকে নিস্তার পাওয়ার পর অর্থনীতি-রাজনীতি থেকে শুরু করে সমাজ-সভ্যতায় কী কী প্রভাব পড়বে তা নিয়েও সম্ভাবনা ও অনুমানভিত্তিক নানারকমের মত বিনিময়-তর্কবিতর্ক চলছে। অণুজীবটির উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান, তার অণুজৈবিক গঠন প্রক্রিয়া, তাকে নিষ্ক্রিয় করার পন্থা ইত্যাদি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও হচ্ছে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, সুস্থ হয়ে যাওয়া রোগীর সংখ্যা এবং মৃত্যুর তথ্য নিয়ে নিয়মিত হয়ে চলেছে নানারকমের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক-উদ্বেগ-আশঙ্কার পরিসরে সবরকমের এবং সববয়সের দর্শক-পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখার জন্য প্রচার মাধ্যমের আদর্শ বিষয়।

এই সুযোগে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর জন-জীবন, পরিষেবা-প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিপণন-বিলয়ন সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ নীলনকশা নির্মাণ করা চলছে। অথবা বলা ভালো, আগামী দিনের জীবনযাপন প্রক্রিয়া এবং কর্মসংস্কৃতির একটা সাধারণ রূপরেখার বাস্তব মহড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসে গিয়েছে। গোপনে বা অগোচরে নয় সর্বসমক্ষে এবং সর্বসম্মতিক্রমে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র হয়ে চলেছে এই নতুন ধারার পরীক্ষা।

'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বা বাড়িতে বসে কাজ করার প্রক্রিয়া বেশ কিছুদিন আগে থেকেই অল্পবিস্তর চালু হয়ে গেছিল। অর্থাৎ নতুন ধারার কাজের ধরন নিয়ে পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরি স্তরে পরীক্ষা চলছিল। করোনার দাপটে এখন তা সর্বাত্মক হয়ে গেছে। পরিভাষায় যাকে বলে ফিল্ড ট্রায়াল। প্রক্রিয়াটি সফল হলে এটিই হয়তো হয়ে যাবে ভবিষ্যতের কর্মসংস্কৃতির সাধারণ বিধি। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নানারকম বিশ্লেষণ, নিরীক্ষণ, রূপরেখা প্রণয়ন, সফটওয়্যার নির্মাণ তো বটেই পরিষেবা ও বিপণন প্রক্রিয়ার বেশির ভাগ কাজই এখন বাড়িতে বসে করতে বলা হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষায়তনে ডাটা সুলভ হয়ে গেলে এর মধ্যে কোনো অবাস্তবতা চোখে না পড়াই স্বাভাবিক। টেলিভিশনের পর্দায় যাঁদের দেখা যাচ্ছে তাঁরাও নিজের ঘরে বসেই ভিডিও বৈঠক করছেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকও বাড়ি থেকেই সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও বৈঠক করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি প্রশাসন পরিচালনার দৈনন্দিন কাজের অধিকাংশই এখন বাড়িতে বসে করা হচ্ছে। অনলাইনেই চলছে আদালতের শুনানি থেকে রায়দান। জরুরি পরিষেবার একটা অংশ, যেমন সাধারণ অসুখের বিষয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা, অনলাইনে চলছে। এবং নিদানও অনলাইনে চলে আসছে। অনলাইনেই উদযাপিত হচ্ছে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান। শিল্পীরা নিজের ঘরে বসেই নিবেদন করছেন তাঁদের সৃজন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজের বাড়িতে থেকে অভিনয় করে খ্যাতনামা শিল্পীরা প্রমাণ করেছেন যথাযথ সংযোজন এবং সম্পাদনা সম্পন্ন করলে অনলাইনে চলচ্চিত্র নির্মাণও অসম্ভব নয়। নেতা-মন্ত্রীরা সাংবাদিকদের সঙ্গে অনলাইনে ভিডিও সম্মেলনে ব্যস্ত। জনৈক নেতা তো অনলাইনে সমস্ত রাজ্যবাসীকে একসঙ্গে একইসময়ে তাঁর বাণী বিতরণ করছেন। নেতার ভক্তদের দাবি এর জন্য রাজ্যজুড়ে হাজার হাজার এলইডি স্ক্রিন টাঙানো হচ্ছে। প্রয়োজনে স্মার্টফোন উপহার দেওয়া হচ্ছে। অর্থনীতি যখন সঙ্কটে জর্জরিত সেই মরশুমে রাজনৈতিক নেতার কোটি কোটি টাকার অরাজনৈতিক প্রচার কতখানি যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার মুহূর্তে কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে বিষয় ভাবনায়

অভিনবত্ব আছে। এইভাবে এগোতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সংসদ বা বিধানসভার অধিবেশনও অনলাইনে আয়োজিত হতে পারে।

অনলাইনে খাবারদাবার আনানো বা পণ্য কেনাকাটার বিষয়টি এতদিনে বেশ বনেদিয়ানায় পরিণত। বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়া, গ্যাস বুকিং, ট্রেন বা বিমানের টিকিট কাটার মতো কাজ অনলাইনে করতে সমাজ অনেকদিন ধরেই অভ্যস্ত। বাধ্যতামূলক ঘরবন্দি অবস্থায় এইসব পুরোনো অভ্যাস নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিতে হচ্ছে অনলাইনের অন্যান্য প্রয়োগ বিধি, যা পরিস্থিতির তাগিদে না শিখলেই নয়। সবমিলিয়ে মানবসভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল বা অনলাইন করার যে উদ্যোগ এতদিন ধরে চলছিল তার ব্যবহারিক পরীক্ষা বা ফিল্ড ট্রায়াল এখন সর্বতোভাবে হয়ে চলেছে।

এই পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে বহু সংস্থাই নিজের নিজের পরিকাঠামোয় পরিবর্তনের পরিকল্পনা করবে। যেসব কাজ ঘরে বসিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় তার জন্য কর্মীদের দপ্তরে নিয়মিত সময় ধরে হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন কোথায়? যেকোনো নির্দেশ অনলাইনে দেওয়া হবে। কোনো বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন হলে তার জন্য সবসময়ই মজুত রয়েছে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাব ইত্যাদি। ডিজিটাল আলোচনা প্রক্রিয়া আরো সহজ সরল করার জন্য প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সফটওয়ার যা চলতি কথায় অ্যাপ নামে পরিচিত।

ঘরে থাকা কর্মীবাহিনী সারাদিন কানে যন্ত্র গুঁজে ছোটো-বড়ো যান্ত্রিক পর্দায় চোখ রেখে নির্দেশ পালনে সদাসতর্ক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সাতসকালে হুড়োহুড়ি করে দপ্তরে ছোটার দিন শেষ। বাস-ট্রেন-মেট্রো-অটো ঠেঙিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বায়োমেট্রিক যন্ত্রে হাতের ছোঁয়া লাগিয়ে দিনের শুরু আর বেলাশেষে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফেরার চিন্তা থেকে অব্যাহতি। পরিবহণ ব্যবস্থাও ভারমুক্ত হবে। পরিবেশ দূষণ নিঃসন্দেহে অনেক কমে যাবে। আনুষঙ্গিক অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বহু মানুষ। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকশিক্ষিকা থেকে শুরু করে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও পরিষেবার কাজে যাঁরা জড়িয়ে আছেন তাঁদের জীবনের রোজনামচা বদলে যাবে। ঘরবন্দি জীবনে এই পরীক্ষায় যাঁদের ইতিমধ্যেই বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত হতে হয়েছে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এখন প্রতিটি কাজের দিন শুরু হচ্ছে কাকডাকা ভোরে আর শেষ হচ্ছে পেঁচাডাকা প্রহরে। আট ঘণ্টার কাজের দিন নিয়ে মাতামাতির দিন শেষ। মে দিবসের ঠাঁই হতে চলেছে ইতিহাসের পুঁথিতে।

উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যাঁরা জড়িয়ে আছেন তাঁরা ইতিমধ্যেই দিন গোনা শুরু করে দিয়েছেন যে কবে থেকে বারো ঘণ্টার কর্মদিবস চালু হবে। পঞ্চাশ শতাংশ কর্মী নিয়ে উৎপাদন শুরুর নিদান দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো শিল্প তো পনেরো শতাংশ কর্মী নিয়েই উৎপাদন শুরু করার নির্দেশ পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মেনে চলতে বলা হচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের জন্য একটু অন্য ভাষায় আদেশনামা জারি হয়েছে। সাতদিন কাজ করে সাতদিন ছুটি। অর্থাৎ পঞ্চাশ শতাংশ কর্মী দিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু রাখা যায় কিনা তা প্রকারান্তরে যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে কাজ এবং কর্মী দুয়েরই ধরন বদলানোর সময় উপস্থিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, বাঃ, বেশ তো, নিত্যকার যাতায়াতের সময়-শ্রম-খরচ বাঁচিয়ে নিজের ঘরে বসে নির্দেশ পালন করতে পারলেই দায়িত্ব শেষ। অর্থাৎ কত সহজে সমগ্র শ্রমব্যবস্থাকে দিনের চব্বিশ ঘণ্টা সপ্তাহের সাত দিন বছরের বারো মাসের শিকলে বেঁধে ফেলার এক নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল।

তবে শহরাঞ্চলের স্বচ্ছল-সম্পন্ন ও দক্ষ কর্মীরাই এই সুযোগ ব্যবহারের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল তো দূরের কথা শহর থেকে একটু দূরের মফস্বলে যাঁদের বসবাস, দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এমন সুবর্ণ সুযোগ তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। ইন্টারনেট সংযোগ সর্বত্র যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বলেই এমনটা ঘটবে। গ্রামগঞ্জে তো বটেই শহরাঞ্চলের বহু এলাকায় ইন্টারনেট উপলব্ধ হলেও মাঝেমধ্যেই তা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিদ্যুৎ সরবরাহও সবসময় স্বাভাবিক থাকে না। অর্থাৎ এই নতুন ব্যবস্থায় কাজ খুঁজে নিতে হলে যেভাবেই হোক নিয়মিত ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যায় এমন এলাকার বাসিন্দা হতেই হবে। এরপরও যদি কর্মীর কর্মকুশলতা নিয়ে নিয়োগকারী সন্তুষ্ট না হন তাহলে বিদায়বার্তা অনলাইনে তৎক্ষণাৎ এসে যাবে। শ্রমের বাজারে চাহিদা কম সরবরাহ অনেক বেশি। প্রয়োজনে কম পারিশ্রমিকে নতুন কর্মী খুঁজে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না। তাছাড়া দপ্তর চালানোর নিত্যদিনের খরচে নিঃসন্দেহে অনেক সাশ্রয় হবে। আজ এখানে কাল ওখানে মিটিং করার জন্য ছোটাছুটি করতে হবে না বলে বিমান ভাড়া, হোটেলের বিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ এক ধাক্কায় অনেক কমে যাবে।

শ্রমব্যবস্থার এই নতুন বিন্যাস কিন্তু পুরোপুরি স্বচ্ছল ও সম্পন্ন কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য। যেমন করোনা সংক্রান্ত যা কিছু সতর্কবার্তা সমাজের এই নির্দিষ্ট অংশের উদ্দেশ্যেই মুহুর্মুহু প্রচারিত হচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোয়ার পরামর্শ থেকে শুরু করে পারস্পরিক ব্যবধান অন্তত তিন ফুট রাখার নির্দেশ দেশের কত শতাংশ মানুষ পালন করতে

পারে? যেদেশে পানীয় জলের জন্য বহু মানুষকে কয়েক ঘণ্টা হাঁটতে হয়, মাসে একবার সাবান ব্যবহার করতে পারলে যে দেশের অধিকাংশ মানুষ বর্তে যায়, দশ ফুট লম্বা দশ ফুট চওড়া ঘরে পাঁচ-সাত জনের পরিবার নিয়ে ঘর-সংসার চালাতে যারা বাধ্য তাদের পক্ষে কি এইসব নিয়মাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব?

তবুও প্রচার চলছে নিরন্তর। কোনো মানুষের ছোঁয়াচে রোগ হলে তাকে পরিবারের মধ্যেই আলাদা করে রাখাই প্রচলিত রীতি। রোগীর থেকে দূরত্ব বজায় রেখেই তার সেবা করা হয়। অর্থাৎ সংক্রমণ এড়িয়ে থাকার জন্য পারস্পরিক প্রত্যক্ষ স্পর্শ পরিহার করতে হয়। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কিন্তু পারস্পরিক নয় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বারেবারে বলা হচ্ছে। যাঁরা এই শব্দচয়ন করেছেন তাঁরা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে অজ্ঞ এমনটি বলার ধৃষ্টতা কে দেখাবে? অথচ পারস্পরিক দূরত্বের বদলে সামাজিক দূরত্ব শব্দবন্ধের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে তাহলে কি সুপরিকল্পিতভাবেই সামাজিক দূরত্বের কথা প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে? সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিদান কি কোনো অন্তর্নিহিত বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে?

ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি সেইরকমই দাঁড়াচ্ছে। ভারতীয় সমাজের স্বচ্ছল ও সম্পন্ন স্তর, সংখ্যার হিসেবে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার কাছাকাছি তাকে বাঁচিয়ে না রাখলে বাজার কী করে বাঁচবে? বাড়ি-গাড়ি কেনার জন্য কে ধার করবে? বাহারী জামাকাপড় থেকে শুরু করে নতুন নতুন ভোগ্যপণ্যের সন্ধানে নিয়মিত শপিং মলে কে যাবে? সন্তানের বিদেশে লেখাপড়ার খরচ জোগাড়ের জন্য ব্যাঙ্কঋণ কে নেবে? প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অন্য রাজ্যের খ্যাতনামা কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়ে বছরের পর বছর খরচ জোগাবে কোন মা-বাবা? সুতরাং বাজারের প্রয়োজনে সমাজের এই বিশেষ অংশের ভালোমন্দ সম্পর্কে খেয়াল না রেখে উপায় নেই।

বিদেশে পড়তে যাওয়া এইসব পড়ুয়ারা অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হলে সরকারি উদ্যোগে ঘরে ফিরে আসতে পারে। বিধি ভেঙে অন্য রাজ্য থেকে সরকারি উদ্যোগে পড়ুয়াদের ঘরে ফিরিয়ে আনা যায়। দেশি হোক বা বিদেশি, ঘরে ফেরা পড়ুয়াদের কোনো শারীরিক পরীক্ষা না করেই অবাধ বিচরণে আপত্তি না থাকায় সমাজের সর্বস্তরে চুঁইয়ে পড়ে সংক্রমণ। অথচ অন্য রাজ্যে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকের ক্ষেত্রে যত আপত্তি। কাজ বন্ধ। রোজগার নেই। অভুক্ত। হাতে নেই টাকাপয়সা। ভাড়া দিতে না পারায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে গেছে। নিজের রাজ্যে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। অবরুদ্ধ রাষ্ট্র জানিয়ে দিল এই পরিস্থিতিতে আন্তঃরাজ্য যাতায়াত নিষিদ্ধ। ভুখা শ্রমিক রাষ্ট্রের হুকুম পালন করতে আপত্তি করেনি। কিন্তু খাদ্য বাসস্থান? রাষ্ট্র নির্বিকার। যেমন অণুজীবের আগমনী বার্তা সম্প্রচারের সময় থেকে শুরু করে অণুজীবের আগমন লগ্নে রাষ্ট্র অন্য অনেক কাজে ব্যস্ত ছিল। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন। দিল্লির দাঙ্গা। 'সত্তর লক্ষ' মানুষের সমাবেশে বিদেশি বন্ধুর নাগরিক সংবর্ধনা। মধ্য প্রদেশের মসনদ দখল। কতই না গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ! অবশেষে সঙ্কট যখন ঘরের দোড়গোড়ায় উপস্থিত তখন শুরু হল হেলাফেলা ছেলেখেলা। তালি-থালি-দিওয়ালি।

অন্যান্য অনেক দেশ অনেক আগেই জাতীয় অবরোধ শুরু করে দিয়েছিল। জাতীয় অবরোধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশে থাকা ভারতীয়দের তড়িঘড়ি দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। সঙ্গে এল অণুজীব করোনা। বিদেশ থেকে ফিরে আসা কোনো সদস্যকে নিভৃতবাস বা হাসপাতালে না পাঠিয়ে পরিবারের সঙ্গে থাকার সুবাদে সেইসব পরিবারের দৈনন্দিন পরিষেবার কাজে যুক্ত গাড়ির চালক, পরিচারক/পরিচারিকা আক্রান্ত হলেন। সমাজের সম্পন্ন স্তর থেকে সংক্রমণ চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়ার সময় যথাযথ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ না নেওয়ায় আস্তে ধীরে শহরাঞ্চলের কিছু কিছু এলাকার বাসিন্দারা সংক্রমিত হতে শুরু করলেন। তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা হল না। সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর করুণ অবস্থা প্রতিদিন প্রচারের আলোয় উন্মুক্ত হওয়ায় উপসর্গবিহীন আক্রান্তরাও নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিলেন না। বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরীক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত সেখানে উপস্থিত হলে সবার আগে দরকার আধার কার্ড এবং সরকারি ডাক্তারের নিদানপত্র বা প্রেসক্রিপশন। অন্যথায় পরীক্ষার সুযোগ নেই। ফলাফল, বিনা পরীক্ষায় বেড়ে গেল সংক্রমণ।

জাতীয় অবরোধের সময় অন্য রাজ্য থেকে আসা প্রবাসী শ্রমিকদের আটকে রাখার পরিকল্পনাও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। দেশ অবরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলকারখানা-নির্মাণশিল্পের কর্নধাররা শ্রমিকের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে শ্রমিকের বকেয়া বেতন দিয়ে তাদের নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে বলেছিলেন বলে জানা যায়নি। তালি-থালি-দিওয়ালির দাপটে হয়তো তাঁদের মনে হয়েছিল যে কিছুদিনের মধ্যেই এই অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান হবে। সরকারি ভাষ্যেও তেমনই ইঙ্গিত ছিল। অন্যথায় ঘোষণার মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে সারা দেশের মানুষকে ঘরবন্দি হয়ে থাকার হুকুমনামা জারি হত না। সেই অনুসারে রীতিমতো হিসেব করেই শ্রমিককে কাজের জায়গায় আটকে রেখে গোটা দেশকে অচল করা হয়েছিল। আশা ছিল উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়া মাত্রই শ্রমিককে আবার কাজে জুড়ে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ

আচমকা নয়, পরিকল্পনার নির্দিষ্ট ছকেই ঘোষিত হয়েছিল লকডাউন বা দেশকে পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে রাখার প্রথম সংস্করণ।

শ্রমিকদের যে এভাবে আটকে রাখা যাবে না রাষ্ট্র তার ধারণা তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারেনি। শ্রমিক ততদিনে সঞ্চিত অর্থ খরচ করে কোনোরকমে পেট চালিয়ে, বাসস্থানের ভাড়া মিটিয়ে পুরোপুরি নিঃস্ব। নিরুপায় শ্রমিক যখন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অসুখের তোয়াক্কা না করে নীল আকাশের নিচে এই পৃথিবীর পথে পথে ছড়িয়ে পড়লেন, হাজার হাজার কিলোমিটার পথ হাঁটা শুরু করলেন তখন রাষ্ট্র নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হল। গোটা দুনিয়ার টিভির পর্দায় তাঁদের ঘরে ফেরার ছবি ছড়িয়ে পড়ছে যে! অগত্যা শ্রমিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে ট্রেনে বাসে গাদাগাদি করে প্রবাসী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার বন্দোবস্ত করে রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষার চেষ্টা চালানো হল। আবার প্রমাণিত হল সামাজিক দূরত্বের সতর্কতা সকলের জন্য উপযোগী নয়। এখানেই কি হয়রানির শেষ? ট্রেন নির্দিষ্ট গন্তব্যের বদলে চলে গেল অন্য কোনো জায়গায়। যাত্রাপথে খাবার নেই। জল নেই। শৌচাগার ব্যবহারের অযোগ্য। পথেই হারিয়ে গেল অনেকের জীবন। আবার পথেই জন্ম নিল অনেকের সন্তান। অনেকেই সংক্রমিত হলেন। কোনো সুরক্ষার বালাই নেই। অবস্থা এতটাই সঙ্গিন। ঘরে ফিরেও স্বস্তি নেই। প্রথম দিকে যাঁরা ফিরে এলেন তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হল রাষ্ট্র নির্ধারিত নিভৃতবাসে। চোদ্দো দিনের নির্বাসন। নিভৃতবাসে থাকতে হবে। একেই হয়তো বলে রাষ্ট্রের রসিকতা। একফালি ঘরে দরিদ্র শ্রমিকের সপরিবারে বসবাস। কে জোগাবে আলাদা শোওয়ার ঘর? আলাদা বাথরুম, পায়খানা, জলের কল? নিজের বাড়িতে এত সুযোগ সুবিধা থাকলে কেউ ভিন্-রাজ্যে গতর খাটাতে যায়? অর্থাৎ বাড়িতেই নিভৃতবাসের ব্যবস্থা করার পরামর্শ মানে রাষ্ট্র সংক্রমণের দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। এই অবসরে রাষ্ট্র ঘোষণা করল যে সারা দেশের আট কোটি প্রবাসী শ্রমিকের আগামী দু-মাস খাওয়াদাওয়া বাবদ সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সত্যিই তো অনেক টাকা। বিজ্ঞাপন এবং প্রচারের জন্য বিরাট ব্যাপার। কেউ একবার হিসেব করে দেখলেন না যে বাস্তবে ঘরে ফেরা প্রবাসী শ্রমিকের জন্য মাথাপিছু প্রতিদিনের বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৭ টাকা ৩০ পয়সা।

গোটা দেশকে অবরুদ্ধ করে দেওয়ার ৭৪ দিন পর মহামান্য আদালত নির্দেশ দিলেন যে পরবর্তী পনেরো দিনের মধ্যে সমস্ত প্রবাসী শ্রমিককে ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আইন আদালত কখন কোন পথে চলে তা বোঝা যায় না। সম্পত্তি কেড়ে নিলে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দেয়। জাতীয় সড়ক নির্মাণ বা বাঁধ বানানোর জন্য অথবা অন্য কোনো জাতীয় স্বার্থে ব্যক্তিগত জমি বা বাড়ি অধিগ্রহণের সময় রাষ্ট্র বাজারমূল্যে জমি বা বাড়ির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেয়। একই যুক্তি সামনে রেখে প্রশ্ন তোলা যায় রাষ্ট্র যখন অবরোধের ফতোয়া জারি করে কর্মরত শ্রমিককে কাজছাড়া করে তখন শ্রমিকের আয়ের উৎস অর্থাৎ শ্রমের দামের জন্য রাষ্ট্র কেন ক্ষতিপূরণ দেবে না? মানবিক বা অনুকম্পার প্রসঙ্গ নয়, নিছক আইনি দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রশ্নটি বিবেচনা করা উচিত। জাতীয় অবরোধের সূচনাপর্বে রাষ্ট্র নির্দেশ দিয়েছিল অবরুদ্ধ সময়ের জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি/বেতন নিয়োগকারীকে মিটিয়ে দিতে হবে। সেই নির্দেশকে অস্বীকার করে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করার পর রাষ্ট্রের নির্দেশ বাতিল হয়ে গেল। যুক্তি হিসেবে বলা হল যে, কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে তা শ্রমিক-কর্মচারীর মজুরি/বেতন কোত্থেকে দেবে! চমৎকার! সর্বোচ্চ আদালতের বিচক্ষণতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েই প্রশ্ন তোলা যায়, কেন আইনি পর্যবেক্ষণ এখানেই শেষ হয়ে গেল। বিষয়টিকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে গেলেই আদালতের নজরে আনা যেত যে প্রতিষ্ঠান বন্ধের ফতোয়া জারি করেছে রাষ্ট্র। কাজেই মজুরি/বেতনের দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্র অস্বীকার করেছে। রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া যেত। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র নিজের কর্মীদের ক্ষেত্রে আদালতের রায় প্রয়োগ করতে চলেছে।

এইসব বিষয়ে যখন আইনি বিচার-বিশ্লেষণ চলছে সেই সময় কিন্তু অবরোধের পঞ্চম সংস্করণ অথবা অবরোধ তুলে নেওয়ার প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয়ে গেছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর মধ্যেই প্রবাসী শ্রমিক পেতে শুরু করেছেন কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ। রীতিমতো বাবা বাছা করে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। কোথাও বাস পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনো শ্রমিকের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে ট্রেনের এসি কামরার টিকিট। চেন্নাই থেকে এক শিল্পপতি তো শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য একটা বিমানই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দোকান-বাজার খুলে দিয়ে, কলকারখানা চালু করে, আপিস-কাছারিতে সকলকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ধাপে ধাপে অবরোধ তুলে নেওয়ার চেষ্টা চালানোর সময় খেয়াল থাকে না যে গণপরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হলে মানুষ আরো বিপদাপন্ন হয়ে যাবে। সংক্রমণ দ্রুত বিস্তৃত হবে। নিয়ম বড়ো বালাই। কাজে না গেলেই নয়। রাষ্ট্রের নির্দেশে অবরুদ্ধ হয়ে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতির জন্য বেতন অথবা পাওনা ছুটি ছাঁটাই শুরু হয়ে গেছে। তাঁদেরও আশঙ্কায় দিন কাটছে। বকেয়া বেতন না দিক কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে না তো? অর্থাৎ নিরন্ন থেকে সম্পন্ন সকলেই এখন সামাজিক দূরত্ব নামের সামাজিক সন্ত্রাসে সন্ত্রস্ত।

সামাজিক দূরত্ব সংক্রান্ত নিরন্তর প্রচার এবং প্রশাসনিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ-সভ্যতা পুরোপুরি বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। সমাজজীবনের মৌলিক শর্তগুলি বিপন্ন। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন থেকে সহযোগিতা-সহমর্মিতা জাতীয় সুকুমার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই অবস্থার বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। হাসপাতালে যে ডাক্তার-সেবাকর্মী আমার আপনার পরিজনের পরিষেবায় জীবনপাত করে চলেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই হয়ে যাচ্ছেন সমাজ পরিত্যক্ত। একটানা সাত-আট দিন কাজ করে বাড়ি ফেরার মুহূর্তে পাড়া বা আবাসন থেকে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলাফল একটি রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন প্রায় শ' চারেক নার্সিং সিস্টার। পুলিশ, দমকল থেকে শুরু করে সমস্ত জরুরি পরিষেবার কর্মীদের একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পাড়ায় বা আবাসনে করোনা আক্রান্ত কোনো রোগীর খোঁজ পাওয়া গেলে প্রতিবেশী হিসেবে পুলিশ বা হাসপাতালে খবর দেওয়া এখন সামাজিক দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। অসুস্থ মানুষটিকে যখন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের গাড়িতে তোলা হয় তখন প্রতিবেশীদের চোখে সহানুভূতি নয় ফুটে ওঠে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে মানুষ আজ এতই উদগ্রীব যে সামাজিক বন্ধনও অস্বীকার করতে আপত্তি নেই। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-নিশ্চয়তা নিয়েই প্রতিটি মানুষ উদ্বিগ্ন। দিনের শেষে নিরন্ন মানুষ ভাবতে থাকেন ঘরে যেটুকু চাল-ডাল আছে তা দিয়ে আর কদিন চলবে। সম্পন্নদের চিন্তা অনলাইনে অর্ডার দেওয়া খাবারদাবার-স্যানিটাইজার আজও এল না, আগামীকাল আসবে তো। কাজছাড়া মানুষ জীবনের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত। সদ্য কাজহারা মানুষের ভাবনা আবার কবে কোথায় কীভাবে একটা নতুন কাজের খোঁজ পাওয়া যায়। সবমিলিয়ে শারীরিক সংক্রমণ এড়ানোর জন্য সামাজিক দূরত্বের যে নিদান দেওয়া হয়েছে তা করোনা নামের অণুজীবের থেকে অনেক দ্রুতগতিতে সামাজিক সন্ত্রাস হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে সভ্যতাকে গ্রাস করে ফেলছে।

সামাজিক সন্ত্রাসের আবহে বদলে যাচ্ছে সামাজিক বিন্যাস। সারা দেশ অবরুদ্ধ। অনলাইনে কিন্তু বেশ কিছু স্কুল কলেজের ক্লাস চলছে। নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধাপ্রাপ্ত সম্পন্ন পরিবারের সন্তানেরাই এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। দেশের বাদবাকি পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কথা পরে ভাবলেও চলবে। তাদের তো মিড ডে মিল বাবদ মাসে মাসে চাল আলু দেওয়া বন্ধ হয়নি। পড়ুয়াদের বদলে তাদের অভিভাবকদের হাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ মাসের শুরুতে চাল আলু তুলে দিচ্ছে। পড়ুয়াদের বাড়ি দূর দূরান্তে হলে চাল আলু নিয়ে স্কুলই পৌঁছে যাচ্ছে পড়ুয়াদের কাছে। শিক্ষকশিক্ষিকাদের চাকরি বজায় রাখতে হবে যে! ট্রেন বা বিমানের যাত্রী হওয়ার প্রাথমিক শর্ত স্মার্টফোন। রাষ্ট্রের নির্দেশে যাঁদের কাছে স্মার্টফোন নেই ট্রেন বা বিমানে চড়ার তাঁর যোগ্যতা নেই। অন্যত্র কর্মরত শ্রমিক দিনের শেষে খাবার পেল কিনা বা রাস্তায় রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে কিনা তা ভাববার সময় কোথায়! হতদরিদ্র মানুষের জন্য বিপদ-আপদে ঢাকঢোল পিটিয়ে ত্রাণ বা ডোল দিলেই চলবে। এক ধাক্কায় সামাজিক বিন্যাসের খোলনলচে বদলে দেওয়া হল। কত সহজে সামাজিক সংহতি বিলুপ্ত করে গড়ে দেওয়া হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক সভ্যতার পরিকাঠামো। জাত-পাত, ধনী-দরিদ্র দ্বন্দ্বে সম্পৃক্ত সভ্যতায় যুক্ত হল এক নতুন মাত্রা যাকে এককথায় সামাজিক সন্ত্রাস বলা যেতে পারে। আমার প্রতিবেশী, সহযাত্রী, সহকর্মী করোনা আক্রান্ত নয় তো, এই সন্দেহ থেকে যে আশঙ্কার উদ্ভব চূড়ান্ত বিচারে সেই সন্দেহ প্রতিটি ব্যক্তি আমি-কে সন্ত্রস্ত করে তোলে। অসুখের সংক্রমণের থেকে অনেক বেশি মাত্রায় সমাজ-সভ্যতা আজ সন্দেহজনিত সন্ত্রাসের শিকার।

নতুন শৈলীর বৈষম্যমূলক শ্রমবিন্যাস আপাতত বাজারের সুরক্ষায় যথার্থ মনে হলেও তার স্থায়িত্ব বেশিদিনের হতে পারে না। সুলভে শ্রম সংগ্রহের জন্য নিয়মিত কর্মী ছাঁটাই চলতেই থাকবে। ফলে, কাজহারা কর্মীদের সঙ্গে কাজছাড়া-ঘরহারা মানুষের সমন্বয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সবমিলিয়ে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন সমীকরণ রচিত হবে। সৃষ্টি হবে নতুন সামাজিক দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বের থেকে যে সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি হবে তার অভিঘাত রাষ্ট্র সহ্য করতে পারবে তো?

মার্কিন বিক্ষোভের নেপথ্যে

শৌভিক চক্রবর্তী

প্রবন্ধটা লিখতে শুরু করলাম, ২০২০ সালের জুন মাসের ৪ তারিখে। একটু আগেই খবরে জানা গেল মোট ৪.৩ কোটি মানুষ বেকার ভাতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ১৮ লাখের বেশি মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। এক লক্ষ সাত হাজারের বেশি মানুষ করোনাতে মৃত। প্রত্যেক ঘণ্টাতে বেড়ে চলেছে এই সংখ্যা। এই তথ্য বা পরিসংখ্যানগুলি একটি দেশের। ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

মনে পড়ে যাচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের ছবি আগন্তুকের কথা। মমতা শঙ্করের বহুকাল পরে ফিরে আসা মামা— উৎপল দত্তের সঙ্গে দেখা করতে এসে রবি ঘোষ তাঁর কাছে বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চান। উৎপল দত্ত তাঁকে যখন জানান যে নিউ ইয়র্ক শহরের রাস্তায় প্রচুর মানুষ 'হোমলেস' প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে থাকেন, তখন রবি ঘোষ খুবই অবাক হয়ে ওঠেন। ভাবতেই পারেন না যে আমেরিকার মতো ধনী দেশেও এবং বিশেষভাবে নিউ ইয়র্ক শহরেও মানুষ গৃহহীন। কিন্তু, বাস্তব যতই আমাদের অবাক করুক আর নির্মম হোক, বাস্তবই কঠোর সত্য। এবং আমেরিকাও সেটারই এক কঠিন নিদর্শন।

আপনারা হয়তো ভাবছেন একজন লেখক হিসেবে আমি হয়তো একটু বেশিমাত্রায় শুরুতেই একটি দেশের নিন্দে করে ফেলছি— বিশেষ করে এই তথাকথিত 'মহান' দেশের। বিশ্বের সমস্ত দেশই এখন খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এখন আমেরিকাকে আলাদা করে দোষ দেওয়া বা আলোচনার বিষয় করা কি ঠিক হচ্ছে? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। গোটা বিশ্ব আজ করোনার প্রকোপে জর্জরিত, এবং সব দেশের জনগণ, প্রধানত শ্রমজীবী মানুষ এবং ছোটো ব্যবসায়ী, এক অত্যধিক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। সেই ক্ষেত্রে আমেরিকা ব্যতিক্রম কেন, এই বিষয়ে দুটি কথা বলে রাখা ভালো।

প্রথমত, সকল দেশের সরকার কিন্তু একইভাবে এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেনি। আমেরিকার জনসংখ্যা ৩৩ কোটি। আপনি যদি এই ছয়টি দেশের— আস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং ভিয়েতনাম— জনসংখ্যা যোগ করেন, তাহলে দেখবেন পরিসংখ্যান দুটো মিলে গেছে। যা মেলাতে পারবেন না, সেটা হল মৃতের সংখ্যা। এই সব দেশ মিলে করোনাতে মৃতের সংখ্যা ১৩০০। এর মধ্যে বিশেষভাবে যেই দেশটির কথা উল্লেখ করা দরকার সেটা হল ভিয়েতনাম— করোনাতে মৃতের সংখ্যা শূন্য। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন— শূন্যই বটে। বুঝতেই পারছেন, দেশ ধনী হলেই হয় না, কারা সরকারে রয়েছেন, এবং নীতি ঠিক করছেন, সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বিশেষ করে যখন একটি দেশ এরকম বিপদের মধ্যে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, অনেক সুযোগ এবং সময় পাওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার ট্রাম্প সরকার এবং রিপাবলিকান দলের সরকারি প্রতিনিধিরা করোনাকে প্রতিরোধ করার জন্য কোনোরকমের প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু নেবে কী করে বলুন? কোনো প্রস্তুতি নিতে গেলে, সেই দেশের রাষ্ট্রপতিকে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের ওপর আস্থা রাখতে হবে। বিশেষত, লড়াইটাই যেখানে হল একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে। এই বছর জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে প্রথম করোনা আক্রান্তের খবর আসে আমেরিকাতে। জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটাকে আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করে। অনেক সতর্কীকরণ থাকা সত্ত্বেও, ট্রাম্প সরকার কোনো কিছুকেই খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। বরং ঠিক উলটো— মানুষকে শুধু একের পর এক ভুল আশ্বাস দিয়ে গেছেন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প। কখনো বলেছেন এপ্রিল মাসেই ম্যাজিকের মতন উধাও হয়ে যাবে এই করোনা ভাইরাস, আবার কখনো বলেছেন ভাইরাসটা বিপজ্জনকই নয়। এ হল এক নতুন ফ্লু। এই কথাগুলির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এরকম বিপদের পরিস্থিতিতে হয়তো রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঠিক নেতৃত্বের গুরুত্ব মানুষের কাছে বেশি করে ধরা পড়ে। তাই, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমেরিকা হয়তো ঐতিহাসিকভাবে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। আসুন, একটু গভীরে গিয়ে দেখা যাক এর নেপথ্যে আর কী কারণ দায়ী এবং এর ভবিষ্যৎ-ই বা কী?

স্বাস্থ্যে মুনাফা

যেকোনো পুঁজিপতির প্রধান ধর্মই হল সব পরিস্থিতিতেই তার মুনাফার বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বা সামাজিক পরিষেবার যেকোনো ব্যবস্থা থেকেই মুনাফা বৃদ্ধির আসল উদ্দেশ্য থেকে তিনি পিছপা হন না। সকলেই জানেন যে আমেরিকার অর্থনীতি হল এক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। তাই, সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের জীবনের দাম মুনাফার ওপরে রাখা হবে, সেই ভাবনা তাই অলীক কল্পনা। এবং, বাস্তবে তা ঘটেও না। তিনটে কথা এই সম্বন্ধে এখানে জানিয়ে রাখা ভালো। প্রথমত, নিউ ইয়র্ক শহরে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এর অনেক কারণ রয়েছে। তবে মুনাফা বৃদ্ধি একটা প্রধান কারণ। অতীতে, সেখানে মুনাফা বেশি হচ্ছিল না বলে হাসপাতালগুলি থেকে প্রচুর ইমারজেন্সি বেড কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। তাই প্রয়োজনের সময় অনেক ঘাটতি দেখা যায়। এই সঙ্কটের মুহূর্তে প্রচুর ডাক্তারকেও কাজ থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। যুক্তি হল করোনার ভয়ে অন্য রুগীদের সংখ্যা কমে যাবে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকাতে চিকিৎসা খরচ সাপেক্ষ। স্বাস্থ্যবীমা ছাড়া, ওই খরচ বহন করা অসম্ভব। তাই, স্বাস্থ্যবীমা না থাকলে ওষুধ কেনা বা ডাক্তার দেখানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই, প্রচুর মানুষ খরচের চিন্তায় ডাক্তার দেখাতে যেতে ভয় পায়। করোনাতে আক্রান্ত হয়েও প্রচুর মানুষ করোনার চিকিৎসা করাতে পারেননি। তৃতীয়ত, উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন উন্নততর বিজ্ঞান। ট্রাম্প প্রশাসন অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে বরাদ্দ টাকা কমিয়ে দিয়েছে। ইবোলা ভাইরাস এবং অনুরূপ ভাইরাস মোকাবিলা করার জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওবামা যেই কর্মসূচি নিয়েছিলেন, ট্রাম্প সরকারি খাতে টাকা বাঁচানোর অজুহাতে সেটিও বন্ধ করে দেয়। তার কী ফল হল, তা এখন সবার চোখের সামনে রয়েছে।

কিন্তু এই সরকারি নীতির আসল মূল্য বহন করে কারা? এই ভুল নীতির মূল্য কী ট্রাম্প বা তাঁর মতন ধনী মানুষেরা যারা অট্টালিকায় নিজেদের বন্ধ করে রেখেছেন এই ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে, তাঁরা বহন করেন? নাকি, এই সমস্ত ভুল নীতির মূল্য দিতে হয় গরিব, শ্রমজীবী মানুষদের? দুঃখের বিষয় হলেও, এর উত্তর আমরা সবাই জানি। স্বভাবতই, গরিব মানুষ বহন করে এই সব সরকারি নীতির ভুলের খেশারত। আমেরিকাও এর কোনো ব্যতিক্রম নয়। দেখা যাক পরিসংখ্যান কী বলছে। তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে মৃত্যুর হার তাঁদের জনসংখ্যার তুলনায় দু-গুণ বেশি। কোনো কোনো রাজ্যে ৪ থেকে ৫ গুণ বেশি। হিস্পানিক এবং লাতিনোদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সংক্রমণের হারও অনেক বেশি। আমেরিকার ৮ রাজ্যের তথ্য থেকে জানা গেছে যে সেটা চার গুনেরও বেশি। কিন্তু সেই তুলনায়, ৩৭টি রাজ্যে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে তাঁদের মৃত্যুর হার জনসংখ্যার তুলনায় অনেকটাই কম। এই তথ্যগুলো একদমই প্রত্যাশিত। কারণ, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এই দুই বর্ণের মানুষরাই আমেরিকাতে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। এবং, তার আসল ঐতিহাসিক কারণ কী তা হয়তো আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। আসুন, বর্তমান সময়ে অর্থনীতির দিক থেকে এই বৈষম্যের কী তাৎপর্য, তা একটু আলোচনা করা যাক।

বর্তমান মার্কিন অর্থনীতি ও বর্ণবৈষম্য

করোনার আগে কী পরিস্থিতি ছিল তা খুব সংক্ষেপে এখানে বলে রাখলে, পাঠকদের বুঝতে হয়তো সুবিধা হবে যে কী কারণে করোনা-পরবর্তী অবস্থা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করল। আপনাদের সামনে ২০১৮ সালের কিছু তথ্য তুলে ধরছি। গড়ে আফ্রিকান-আমেরিকানদের তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের সম্পদের পরিমাণ ঠিক ১০ গুণ। গড়ে আফ্রিকান-আমেরিকানদের তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের আয়ের পরিমাণ প্রায় দুই গুণ। দারিদ্রের ক্ষেত্রে আফ্রিকান-আমেরিকানদের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি। স্বাস্থ্যবীমা না থাকার দৌড়ে আফ্রিকান-আমেরিকানদের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় প্রায় দুই গুণ বেশি। এই পরিস্থিতিতে অনুমান করা সহজ কেন আফ্রিকান-আমেরিকানদের অবস্থা করোনার জন্য এমন শোচনীয় হল। হঠাৎ করে হয়নি। ঐতিহাসিক বঞ্চনা ও দীর্ঘ সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদের জন্য তাঁদের পরিস্থিতি অনেক দিন ধরেই খারাপ। করোনা ভাইরাস দুটি পরিবর্তন এনেছে। এক, গোটা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে এই দারিদ্রের চিত্র। দুই, করোনার জন্য যে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছে, তার ফলে আফ্রিকান-আমেরিকানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আরো দ্রুতবেগে খারাপ হয়েছে।

সে প্রাকৃতিক দুর্যোগই হোক বা অর্থনৈতিক মন্দার কুপ্রভাবই হোক, এর সবথেকে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মাপকাঠিতে যারা পিছিয়ে আছেন তাঁদের ওপর। এর প্রমাণ ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যায়। বিশ্বজুড়ে ১৯২৯-৩৩ সালে যেই আর্থিক মন্দার আঘাত সবার উপরে নেমে এসেছিল, সেই ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে আফ্রিকান-আমেরিকানরা সবচেয়ে বেশি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তখন একটা কথা খুব প্রচলিত ছিল আমেরিকাতে— ‘last hired, first fired’। অর্থাৎ, চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে আফ্রিকান-আমেরিকানদের

সুযোগ যদিও শেষে, চাকরি হারানোর ক্ষেত্রে তাঁরাই প্রথম সারিতে। ওই সময় আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৫০ শতাংশেরও বেশি ছিল। ২০০৮-২০০৯-এর আর্থিক মন্দার কারণে আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২০১১ সালে ছিল ১৫.৮ শতাংশ, হিস্পানিক ও লাতিন-আমেরিকানদের মধ্যে এর হার ছিল ১১.৫ শতাংশ। যদিও একই সময় বেকারত্বের হার শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ছিল ৮ শতাংশ। এই তথ্যগুলি থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে মন্দার সময় দুর্বলদের ওপরে তার কুপ্রভাব সর্বাধিক। এই অর্থনৈতিক দুর্বলতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাঁদের সামাজিক অবস্থান। যেই অবস্থানের জন্য তাঁরা বহু বছর ধরে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং বিবিধ বৈষম্যের শিকার।

সামাজিক বঞ্চনা, পুলিশি ও আইনি দ্বিচারিতা

একটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক ব্যবস্থায় আইন এবং আইনের রক্ষকরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা সমাজের ধনী ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য যেন তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হয়। খুব ভুল বলা হবে না, যদি বলি তাঁদের তোষণ করার জন্য। সেই কারণে পুলিশের হাতকেও সমাজের পুঁজিপতিরা বিভিন্ন দিক দিয়ে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী করে রাখে। তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হল পুলিশের খাতে যেই হারে আমেরিকাতে খরচ করা হয়।

গোটা ইউরোপের তুলনায় আমেরিকাতে বেশি অর্থ খরচ করা হয় অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষার জন্য। একই তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে আমেরিকায় তাদের উৎপাদনের মাত্র ১৮.৭ শতাংশ বরাদ্দ করা হয় সামাজিক উন্নয়নের খাতে, যেখানে ফ্রান্স এবং জার্মানিতে যথাক্রমে তা ৩১.২ এবং ২৫.১ শতাংশ। অনেক পণ্ডিতের মতে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য যদি মার্কিন সরকার বেশি করে খরচ করত, তাহলে হয়তো আইনশৃঙ্খলা বজায়ের জন্য এতো টাকা খরচ করার কোনো প্রয়োজন হত না। উপরন্তু, এরকম নয় যে এই খরচ শুধু কেন্দ্রীয় সরকার করে চলেছে। রাজ্য ও স্থানীয় সরকারও একইভাবে খরচ করে চলেছে পুলিশি খাতে। ওকল্যান্ড তাদের মোট বাজেটের ৪১ শতাংশ বরাদ্দ করে পুলিশি খাতে। মিনিয়াপলিস বা হুস্টন খরচ করে যথাক্রমে ৩৬ এবং ৩৫ শতাংশ।

এইখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল এত খরচ করেও আমেরিকাতে মানুষরা কী বেশি সুরক্ষিত আছে? আপাতদৃষ্টিতে হয়তো এরকম মনে হলেও, তথ্য অন্য কথা বলছে। প্রতিবেশী দেশ কানাডার তুলনায়, আমেরিকাতে খুনের হার চার গুণ বেশি। ডেনমার্কের তুলনায় ধর্ষণের হারও চার গুণ বেশি। পোল্যান্ডের তুলনায় ডাকাতির হার দুই গুণ বেশি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক মানুষ কারাগারে বন্দি। ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রত্যেক এক লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬৯৮ জন কারাগারে বন্দি। সর্বোচ্চ কারাগারে বন্দির হার হল ওকলাহোমা শহরে। প্রত্যেক এক লক্ষ মানুষের মধ্যে ১০৭৯ জন কারাগারে বন্দি। লুইসিয়ানা শহরকে ছাড়িয়ে, ওকলাহোমা হল এখন 'বিশ্বের কারাগার রাজধানী'।

আর একটু খতিয়ে দেখলে দেখব যে এই তথ্যগুলি আফ্রিকান-আমেরিকানদের জন্য আরো ভয়াবহ। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ৪০ বছর আগের পরিপ্রেক্ষিতে এখন প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গের তুলনায় আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে কারাবন্দী হওয়ার হার পাঁচ গুণ বেশি। সেন্টার ফর আমেরিকান প্রোগ্রেস-এর গবেষণা থেকে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে। মিলেনিয়ালদের মধ্যে প্রত্যেক ৪ জনে একজনকে পাওয়া গেছে যাঁরা ১৮ বছর হওয়ার আগেই, তাঁদের কাছের মানুষরা কারাগারে বন্দী ছিল। ১৯৯০-র পরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেক তিন জনের জন্য এই তথ্য সত্যি। ওই একই গবেষণা থেকে এও জানা গেছে যে আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলাদের ক্ষেত্রেও একই ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ মহিলার তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা দুইগুণ বেশি কারাগারে বন্দী, এবং যুবতীদের মধ্যে এর হার তিনগুণ বেশি। এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে? একটা কারণ যা বিশেষভাবে এখন আলোচিত হচ্ছে তাহল কারাগারে বন্দী শ্রমিকরা খুবই কম বেতন পান তাঁদের শ্রমের বিনিময়ে, তাই, হয়তো এ এক নতুন ধরনের ক্রীতদাসত্বের শুরু।

এ তো গেল কারাগারে বন্দীর কথা। এর থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ তথ্য হল পুলিশের হাতে নির্যাতন ও হত্যার। ইংল্যান্ডের গার্ডিয়ান খবরের কাগজের সূত্রে জানা গেছে যে ২০১৫ সালের প্রথম ২৪ দিনের মধ্যে আমেরিকার পুলিশ যত মানুষকে হত্যা করেছে, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে একত্রে পুলিশ শেষ ২৪ বছরে এত লোকের হত্যা করেনি। উপরন্তু পুলিশের হাতে মৃত্যুর হার আফ্রিকান-আমেরিকানদের ক্ষেত্রে দুই গুণ বেশি। এই ঘটনা দৈনন্দিন ঘটে চলেছে আমেরিকার রাস্তায়, বিশেষ করে আফ্রিকান-আমেরিকানদের পাড়াতে।

প্রতিরোধ ও সংগঠিত আন্দোলন

পুলিশের অত্যাচারের কথা সাম্প্রতিক কালে অনেক বেশি শোনা গেছে। মোবাইল ফোনের উন্নত প্রযুক্তির জন্য আজকাল পুলিশি অত্যাচারের ভিডিও সকলের সামনে সহজেই চলে আসছে। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ মে মাসের ২৫ তারিখে

জর্জ ফ্লয়েড নামে এক আফ্রিকান-আমেরিকানের মিনিয়াপোলিস পুলিশের হাতে মর্মান্তিক মৃত্যু। এই হত্যার দৃশ্য এতটাই মর্মান্তিক ছিল যে প্রচুর মানুষ এই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেন। এরই প্রভাবে শুরু হয় বিশাল প্রতিরোধ। রাস্তায় নেমে পড়েন হাজার হাজার মানুষ এই অত্যাচারের প্রতিবাদে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই আন্দোলনের জন্য এই ঘটনাটি একমাত্র দায়ী নয়। এই ঘটনাটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। বহু দশকের অত্যাচার এবং উৎপীড়নে জর্জরিত শেণির মানুষ আজ পথে নামতে বাধ্য হয়েছে। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, সামাজিক ভেদাভেদ এবং লাঞ্ছনা আজ এই মানুষদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছে। তার ওপর এই করোনা ভাইরাসের জন্য আজ এদের অবস্থা আরো বিপন্ন। তাই তারা আজ পথে। নিজেদের কণ্ঠে তুলে ধরেছে প্রতিবাদের ভাষা।

এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ফলে প্রচুর সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, দোকান লুট করা হয়েছে এবং অনেক মানুষ আর পুলিশও আহত হয়েছেন। প্রত্যেকটি ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু, বহু দশকের অত্যাচার এই আফ্রিকান-আমেরিকান ও হিস্পানিকদের ওপর করা হয়েছে তার বিরুদ্ধেও নিন্দাকারীদের মুখ খুলতে হবে। শুধু পুলিশের নয়, নিন্দা করতে হবে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, যেখানে ন্যূনতম বেতন থেকে শুরু করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ— সবই করতে হয় এই আফ্রিকান-আমেরিকান আর হিস্পানিক সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের। আজ তারা রাস্তায় সেই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাস্তায়।

আমরা কি সত্যিই কেউ এই আন্দোলনের সঠিক পথ এবং পদ্ধতি কী তার বিচার করতে পারি? আমরা খবরের কাগজে বা সংবাদমাধ্যমে দাঙ্গার ছবি বা লুটপাটের খবর পড়ে হয়তো নাক সিঁটকচ্ছি। কিন্তু বছরের পর বছর যদি আপনি বা আপনার সম্প্রদায়ের মানুষরা একইভাবে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হতেন, তখন হয়তো আমাদের মধ্যে অনেককেই প্রতিবাদের ওই একই রাস্তা বেছে নিতে হত। এখানে মার্টিন লুথার কিং-এর একটা কথা প্রণিধানযোগ্য— 'দাঙ্গা হল সামাজিকভাবে ধ্বংসাত্মক এবং স্বপরাজিত। তবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দাঙ্গা হল অশ্রুতদের ভাষা'। এখানে পাঠকদের মনে করিয়ে দিই যে কিং মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিলেন এবং গান্ধীর দেখানো অহিংসার বিপ্লবী শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিও তাই দাঙ্গার পূর্ণ সমর্থন না করলেও, তার আসল কারণ কী সেই নিয়ে ভাবতে আবেদন জানিয়েছিলেন।

আজ তাই তারই ফলপ্রসূ হিসেবে আমরা এই আন্দোলনের সপক্ষে যেই সমর্থন দেখতে পাচ্ছি বিশ্বজুড়ে সেটাই হয়তো প্রত্যাশিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধু আফ্রিকান-আমেরিকানরাই আজ রাস্তায় নামেনি, তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের এক বড়ো অংশ। বার্লিন থেকে শুরু করে সিডনি, লন্ডন থেকে প্রিটোরিয়া, হাজার হাজার মানুষ আজ বিশ্বজুড়ে রাস্তায় নেমেছে ফ্লয়ডের মৃত্যুর প্রতিবাদে। সমগ্র মানবজাতিরই আজ উচিৎ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানানো। আসুন আমরা এই আশা রাখি যেন এই স্ফুলিঙ্গ থেকেই শুরু হয় কালকের দাবানল যা সমাজের যেকোনো দুর্বল শ্রেণির ওপর অত্যাচারকে রুখে দিতে সক্ষম হবে।

সাদা-কালোয় মুখোমুখি দুই আমেরিকা

শান্তনু দে

পঞ্চাশ বছর আগে কার্নার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকে আজও মার্কিনমুলুকে পরিস্থিতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সেদিন, মার্টিন লুথার কিং যে রিপোর্টকে বলেছিলেন, 'মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর প্রতি ডাক্তারের সতর্কবার্তা, সঙ্গে জীবনের জন্য একটি প্রেসক্রিপশন।'

২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮। কার্নার রিপোর্টের সবচেয়ে জরুরি সতর্কবার্তা ছিল, 'আমাদের সমাজ ভাগ হয়ে যাচ্ছে দুটি সমাজে— একটি কৃষ্ণাঙ্গ, অন্যটি শ্বেতাঙ্গ— আলাদা এবং অসম।'

সেইসঙ্গেই শ্বেতাঙ্গ মার্কিন নাগরিকদের প্রতি ছিল জোরালো অভিযোগ : 'শ্বেতাঙ্গ মার্কিন নাগরিকরা যা কখনো পুরোপুরি উপলব্ধি করেননি, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গরা যা কখনো ভুলতে পারেন না— তা হল, এই ঘেটো (বস্তি)-র মধ্যেই রয়েছে শ্বেতাঙ্গ সমাজের গভীর তাৎপর্য। শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলি একে রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজ কিছু না দেখার ভান করে চলেছে।'

এবং পঞ্চাশ বছর পর মার্কিন সমাজে এখনও এটাই দস্তুর।

২০১৪-র জুলাইয়ে নিউ ইয়র্কে এরিক গার্নারের পর মে'তে মিনিয়াপোলিসে জর্জ ফ্লয়েড। কী আশ্চর্য, ছ-বছর আগে শ্বেতাঙ্গ মার্কিন পুলিশ যখন এরিককে রাস্তায় ফেলে গলা টিপে ধরে, তখনও তাঁর কাতর আর্তি ছিল 'আমি দম নিতে পারছি না'। ভিডিও ফুটেজ বলছে, একবার নয়, ১১-বার। তবুও পাশবিক বর্বরতায় নিশ্চিত করা হয়েছিল এরিকের মৃত্যু। এবারেও যেমন ঘটেছে ফ্লয়েডের ক্ষেত্রে।

নিরাপত্তারক্ষী ফ্লয়েড মহামারিতে কাজ হারিয়েছিলেন। ২০ ডলারের একটি নোট নিয়ে গিয়েছিলেন খাবার কিনতে। পুলিশের দাবি সেটা নাকি জাল। সেই অপরাধে ফ্লয়েডকে রাস্তায় ফেলে শ্বেতাঙ্গ অফিসার ঘাড়ে ভারি বুট চেপে ধরে ডলতে শুরু করে তাঁর গলা। প্রায় ন'মিনিট। মিনিটতিনেকের মধ্যেই নিস্পন্দ হয়ে যায় তাঁর শরীর। তবুও। আসলে এরিক, বা ফ্লয়েডের খুন হওয়া মোটেই আকস্মিক নয়। তাঁদের মরতেই হত। ২০ ডলারের 'জাল' নোট রাখা নয়, তাঁর বা তাঁদের আসল অপরাধ তাঁরা কৃষ্ণাঙ্গ।

মার্কিন পুলিশের এই বর্ণবিদ্বেষী আচরণের শিকড় রয়েছে ২৫০ বছরের দাসব্যবস্থা, নব্বই বছরের জিম ক্রো আইনের মধ্যে। ২০১৯, এক বছরে পুলিশের গুলিতে ১,০৪২ জন হত্যার ঘটনায়— দেশের জনসংখ্যায় কৃষ্ণাঙ্গদের হার ১৩ শতাংশের কম হলেও, পুলিশের হাতে হত্যার ঘটনায় তাঁদের হার শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি (ওয়াশিংটন পোস্ট)। প্রতি দশ লক্ষে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা যেখানে ১২, সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ ৩১।

প্রতিবাদে ক্রোধে ফুটছে আমেরিকা। স্বাভাবিক। রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা। ওয়াশিংটনের রাস্তায় চলছে অবাধে ভাঙচুর। নিউ ইয়র্কের পথে দোতলা সমান আগুন। কোথাও পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ছে। কোথাও পুলিশই হাঁটু মুড়ে ক্ষমা চাইছে বিক্ষোভকারীদের কাছে। সর্বোপরি, ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে হোয়াইট হাউস। বিক্ষোভকারীদের ভয়ে বিশ্ব-কাঁপানো মার্কিন রাষ্ট্রপতি ঢুকে পড়ছেন গোপন বাঙ্কারে। হোয়াইট হাউসের মধ্যেই ওই বাঙ্কার তৈরি করা আছে জরুরি ঘটনা বা সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করার জন্য। দেশের নাগরিকরাই এখন ট্রাম্পকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সেই বাঙ্কারে।

কদিন আগে ইকুয়েদরে জনরোষ এমন চেহারা নিয়েছিল যে রাজধানী থেকে প্রশাসনকে গুটিয়ে নিয়ে যেতে হয় অন্যত্র। বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্রপতি লেনিন (কাউটস্কি) মোরোনোকে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় রক্ষণশীলদের শক্ত ঘাঁটি গুয়াইয়াকুইলে, নৌবাহিনীর বাঙ্কারে।

কিন্তু, তাই বলে ট্রাম্পকে!

মিনেসোটা প্রদেশের বৃহত্তম শহর মিনিয়াপোলিসে পুলিশের হাতে নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের গতিতে। দু সপ্তাহ হয়ে গেল প্রতিবাদ থেমে যায়নি।

বরং তার বহর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দেশের পঞ্চাশটি প্রদেশের ৮০৬টি শহরে হয়েছে বিক্ষোভ (ইউএসএ টুডে, ৮ জুন)। এক ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশেই বিক্ষোভ হয়েছে ৬৪টি শহরে। জর্জিয়াতে ৪৫টি শহরে, নিউ ইয়র্কে ৩২টি শহরে। বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছে গুয়াম, পুয়ের্তো রিকো এবং ভার্জিনিয়া দ্বীপপুঞ্জে। মার্কিনমুলুকে বিক্ষোভ দমনে নামানো হয়েছে রিজার্ভ মিলিটারি ফোর্স 'ন্যাশনাল গার্ড'— যা এই মুহূর্তে ইরাক, আফগানিস্তানে মোতায়েন থাকা মার্কিন সেনার চেয়ে বেশি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১০ হাজারের বেশি প্রতিবাদীকে। হত্যা করা হয়েছে অন্তত ১২ জনকে, যাঁদের অধিকাংশই কৃষ্ণাঙ্গ। নিউ ইয়ক, শিকাগোসহ অন্তত তিরিশটি শহরে জারি করতে হয়েছে কারফিউ। বিক্ষোভ মোকাবিলায় সেনা নামানোর হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। লক্ষণীয়ভাবে মার্কিন ক্ষমতা ও ধনসম্পত্তির কেন্দ্রগুলিতেই বিক্ষোভের মাত্রা সবচেয়ে চড়া। যেমন ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউস, তেমনই নিউ ইয়র্ক সিটিতে ট্রাম্প টাওয়ার। ভাঙচুর জর্জিয়ায় সিএনএন সদর দপ্তরে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়। মার্কিন বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে এবং নিজেদের দেশে বর্ণবাদ ও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। সংহতি আন্দোলন এখন সব মহাদেশে, সব দেশে। লন্ডন থেকে লিসবন, বার্লিন থেকে রোম, প্যারিস থেকে মাদ্রিদ, ভিয়েনা থেকে ওয়ারশ। আক্রা থেকে ডাবলিন, কলকাতা থেকে মেলবোর্ন।

১৯৬৭, সেবারও মার্কিনমুলুকে শহরে-শহরে জ্বলেছিল আগুন। তার পরেই কার্নার কমিশন। সাত মাস তদন্তের পর কমিশন তার রিপোর্ট প্রকাশ করে ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারিতে। আর তার ঠিক দু-মাসের মধ্যেই এপ্রিলের গোড়ায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন মার্টিন লুথার কিং। পরে নিউ ইয়র্কের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যান্ড্রু হেকার লেখেন : 'টু নেশনস: ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, সেপারেট, হোস্টাইল, আনইকুয়াল।'

কিন্তু আজও পরিস্থিতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

প্রতি ১ ডলার শ্বেতাঙ্গ আয়ের নিরিখে কৃষ্ণাঙ্গদের আয় মেরেকেটে ৬০ সেন্ট। প্রতি ১ ডলার শ্বেতাঙ্গ সম্পদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গদের সম্পদের পরিমাণ মাত্র ১০ সেন্ট। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় দ্বিগুণ দারিদ্র্য কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে (অ্যাসোসিয়েট প্রেস, ৮ জুন)। কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য বরাদ্দ সস্তা মজুরির কাজ। সেই একই অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে তাঁদের বাস। কোভিডে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এই কৃষ্ণাঙ্গরাই। এপিএম ল্যাবের একটি সমীক্ষায় কোভিডে মৃত্যু হার শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গদের প্রায় আড়াই গুণ বেশি। জনসংখ্যায় কৃষ্ণাঙ্গদের হার ১৩ শতাংশের কম হলেও, কোভিডে মৃত্যুহার ২৪ শতাংশ। শ্বেতাঙ্গ পরিবারের গড়পড়তা আয় যেখানে ৬৬,৯৪৩ ডলার, সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের মাত্র ৪১,৩৬১ ডলার। শ্বেতাঙ্গদের গড় আয়ু যেখানে ৭৯, সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের ৭৪।

উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ট্রাম্প যেদিন চরম অবজ্ঞায় 'কুৎসিত দেশ' বলেছিলেন, সেদিনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অশ্বেতাঙ্গরা বুঝে গিয়েছিলেন তাঁদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই। করোনায় বেআব্রু মার্কিন দম্ভ। দেখে মনে হচ্ছে যেন রোয়ান্ডা। মৃত্যু ১,০০,০০০ ছাড়িয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর। আজ, এই মুহূর্তে ট্রাম্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা, প্রাক্তন গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি জনগণকে 'মার্কিন জীবনধারার' জন্য 'আত্মত্যাগ করতে' বলেছেন।

যে 'জীবনধারায়' যখন যুদ্ধবিমানের প্রাচুর্য্য থাকে, তখন জীবনদায়ী ভেন্টিলেটর থাকে সাকুল্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার, যেখানে অসুস্থ্যদের চিকিৎসার জন্য দরকার ১০ লক্ষের বেশি। যে জীবনধারায় দেশের অর্ধেক মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করে একটি বেতন পাওয়া থেকে আরেক বেতনের অপেক্ষায়, ৪ কোটি মানুষ রয়েছেন দারিদ্র্যের মধ্যে, ৮ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের হয় কোনো বীমা নেই, অথবা যে বীমাটুকু আছে তাতে সামান্য চিকিৎসা পর্যন্ত হয় না, এবং ৫ লক্ষ এমন মানুষ আছেন, যাঁদের নেই মাথা গোঁজার কোনো জায়গা।

যে জীবনধারায় নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু হয় পুলিশের নির্বিকার গুলিতে, বিপরীতে মিশিগানে বিক্ষোভরত সশস্ত্র নব্য-নাৎসিদের রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সার্টিফিকেট দেন: ওরা সবাই 'ভালো মানুষ'! লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণায় 'স্বস্তিকা' প্রতীক নিয়ে মিশিগানের আইনসভার সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয় নব্য-নাৎসিরা। আর তা দেখে মিশিগানের ডেমোক্র্যাট গভর্নর গ্রেচেন হুইটনারকে ওইসব 'ভালো মানুষদের' সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বলেন ট্রাম্প। এক টুইটে ট্রাম্প বলেন, 'ওরা সবাই ভালো মানুষ। তবে ক্ষুব্ধ। ওরা নিরাপদে ওদের আগের জীবনে ফিরে যেতে চান। ওদের দিকে তাকান, ওদের কথা শুনুন, একটা বোঝাপড়ায় আসুন।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উগ্র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির উপর গবেষণা করে থাকে সাউদার্ন পভার্টি ল সেন্টার। তাদের সমীক্ষা বলছে, ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৫ শতাংশ।

করোনা মোকাবিলায় ট্রাম্পের হাতিয়ার বর্ণবিদ্বেষ। যে কারণে বিক্ষোভ দমনে রকের ভাষায় 'হিংস্র কুকুর লেলিয়ে' দেওয়ার হুমকি দেন। কিংবা চোখ রাঙিয়ে বলেন, 'লুট শুরু হলে, শুরু হবে শুট (গুলি)।'

অন্যদিকে একুশে মে, মার্কিন ডাকসাইটে আর্থিক পত্রিকা

ফরচুনে আর্তনাদ: মার্কিনমুলুকে প্রকৃত বেকারত্বের হার ছাড়িয়েছে সাড়ে ২২ শতাংশ। যা মহামন্দার সময়ে সর্বোচ্চ শিখরে (১৯৩৩) পৌঁছনো বেকারত্বের হার ৩৫.৬ শতাংশের ঠিক নিচে। মার্কিন শ্রমদপ্তরের হিসেবে, মহামারির সময় (মধ্য-মার্চ থেকে) বেকারভাতার জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ। যা মার্কিনমুলুকের ২১টি প্রদেশের মিলিত জনসংখ্যার চেয়ে বেশি।

মে মাসের গোড়ায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, ছাঁটাই কাজের ৪২ শতাংশই মুছে গিয়েছে পাকাপাকিভাবে। এপ্রিলের শেষে, আর মে'র গোড়ায় সেনসাস ব্যুরোর একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্কদের ৪৭ শতাংশ, অথবা তাঁর পরিবারের কেউ মার্চের ১৩ তারিখ থেকে কাজ হারিয়েছেন। ৩৯ শতাংশের আশঙ্কা, তাঁর অথবা পরিবারের কেউ একজন আগামী মাসের মধ্যে কাজ হারাবেন। ১১ শতাংশ জানিয়েছেন তাঁরা সময়মতো ভাড়া দিতে পারেননি, অথবা কিস্তির অর্থ মেটাতে পারেননি। আগামী মাসে দেওয়ার ব্যাপারে সংশয়ে ২১ শতাংশ।

এই পরিস্থিতিতে করোনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও প্রাণহানির শিকার হয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গরা। কৃষ্ণাঙ্গদের মৃত্যুঝুঁকি কমাতে সরকারের দিক থেকে নেওয়া হয়নি কোনো বিশেষ পদক্ষেপ। উলটে লাগাতার বর্ণবাদী নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। জীবন যন্ত্রণায় কৃষ্ণাঙ্গরা যখন ফুঁসছিলেন, ঠিক তখনই শ্বেতাঙ্গ এক পুলিশকর্তার হাতে নির্মমভাবে খুন হন কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড।

'আমি দম নিতে পারছি না' স্লোগান তাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে শহরে-শহরে। ঠিকই, মার্কিনমুলুকে বিলিওনেয়ার আর কতিপয় ধনী ছাড়া কে-ই বা 'দম নিতে' পারছেন! প্রতিবাদ-বিক্ষোভে তাই কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গরা। ছাঁটাই শ্রমিক থেকে বেকার যুবক। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বা কেন? পুঁজিবাদী এই দুনিয়াতে কে-ই বা 'দম নিতে' পারছেন! গ্রিসের এথেন্সে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে চওড়া ব্যানারে তাই স্লোগান: 'পুঁজিবাদের অর্থ: আমি দম নিতে পারছি না'।

এই বিক্ষোভের শিকড়ে রয়েছে আসলে বর্ণবাদ, জাতিবিদ্বেষ, অসাম্য আর সামাজিক অবিচার।

যে কারণে নিউ ইয়ক টাইমসে রেক্সোনা গে'র জিজ্ঞাসা, 'করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আজ না হয় কাল আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু আমেরিকার মতো মহান দেশে বর্ণবাদের যে বিষাক্ত ভাইরাস ছড়িয়ে আছে, তার টিকা কি আবিষ্কার করা যাবে? শুধু হ্যাশট্যাগের বর্ণবাদ-বিরোধিতা কি আমেরিকাকে রক্ষা করতে পারবে?'

আসলে এই বৈষম্যের রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। জড়িয়ে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোগত ভিত্তির শিকড়ে। এবং যা তার শ্রেণি অভিমুখের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ তাই এই তুমুল কলরবকে অবজ্ঞা করা অসম্ভব। বিশেষ করে যখন তাঁরা দাবি করছেন সম্মান, সমতা আর ন্যায়বিচারের।

আজ থেকে বহু বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রীদের প্রতি লেনিনের আবেদন ছিল তাঁরা যেন শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। মার্কিনমুলুকে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা, শোষণ এবং বর্ণের ভিত্তিতে নির্মিত 'জাতীয়করণের' ধারণা শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তোলার পক্ষে অন্তরায়, দৃঢ়ভাবে মনে করতেন লেনিন।

১৯১৩-তে প্রকাশিত 'ক্রিটিকাল রিমার্কস অফ ন্যাশনাল কোয়েশ্চেনস'-এ লেনিন লিখেছেন,

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদেশগুলির উত্তর ও দক্ষিণভাগে বিভাজন জীবনযাপনের সব শাখাতেই প্রতীয়মান হচ্ছে। উত্তরের প্রদেশগুলির বরাবরের ঐতিহ্য স্বাধীনতার, দাস মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের, তেমনি দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে রয়েছে দাস মালিকানা, কৃষ্ণাঙ্গদের উপর নিপীড়ন, যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে আক্রান্ত এবং সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে (৪৪ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ নিরক্ষর, যেখানে শ্বেতাঙ্গরা মাত্র ৬ শতাংশ)। উত্তরের প্রদেশগুলিতে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গ শিশুদের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ে। দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের জন্য রয়েছে পৃথক 'ন্যাশনাল' বা বর্ণবৈষম্যের স্কুল। আমার মনে হয় এটিই স্কুলগুলির 'জাতীয়করণ'-এর একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত।'

ছাপ্পান্ন বছর আগে ওয়াশিংটনে আড়াই লক্ষের বেশি মানুষের সমাবেশে মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন : 'আই হ্যাভ অ্যা ড্রিম।' আমার একটি স্বপ্ন আছে।

এই স্বপ্ন শুধু কিংয়ের একার নয়। সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের স্বপ্ন। দুনিয়ার সমস্ত শুভবুদ্ধির, প্রগতিশীল মানুষের স্বপ্ন।

কিংয়ের সেই ভাষণের মর্মবস্তু আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে পেয়েছে বৈধতা। তাঁর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি এখন গোটা মার্কিনমুলুকে। উপকূল থেকে উপকূলে। পশ্চিম উপকূলের লস অ্যাঞ্জেলস থেকে পূর্ব উপকূলের মিয়ামিতে।

২৮ আগস্ট, ১৯৬৩। ওয়াশিংটনে বিরাট সমাবেশে কিং বলেছিলেন :

> আমার বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের বলছি, যদিও আমরা আজ এবং আগামী দিনগুলিতেও সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কিন্তু তাও আমি স্বপ্ন দেখি। এটি এমন একটি স্বপ্ন যার শিকড় আমেরিকার মানুষের স্বপ্নের গভীরে গেঁথে রয়েছে। আমি এমন একটি স্বপ্ন দেখি যেখানে একদিন আমাদের এই দেশ ঠিক মাথা তুলে দাঁড়াবে, অন্তর থেকে সে সত্যি সত্যি যা বিশ্বাস করে,

তাকে নিয়ে বাঁচবে : 'নিজের থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠা সেই সত্যগুলিকে আমরা আঁকড়ে ধরব, যেখানে সমস্ত মানুষই সমানভাবে গড়ে উঠবে।

এই পরিস্থিতিতে একমাত্র শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব, মানবতাই সভ্যতার পথ।

যে স্বপ্ন একদিন কিং দেখতেন। যেমন বলেছিলেন তিনি ওয়াশিংটনের সমাবেশে।

আমার একটি স্বপ্ন আছে— একদিন জর্জিয়ার লালপাহাড়ে, একসময়ের দাসের সন্তান আর একসময়ের দাস-মালিকের সন্তান একসঙ্গে ভ্রাতৃত্বের আসনে বসতে সক্ষম হবে। আমার একটি স্বপ্ন আছে— একদিন, এমনকি মিসিসিপি প্রদেশ, যে প্রদেশটি ছটফট করছে অবিচারের উত্তাপে, যে ছটফট করছে শোষণ নিপীড়নের উত্তাপে, একদিন তা পালটে গিয়ে হয়ে উঠবে মুক্তি আর ন্যায়ের মরুদ্যান। আমার একটি স্বপ্ন আছে— আমার ছোট্ট চার সন্তান, একদিন এমন একটি দেশের মধ্যে বসবাস করবে, যেখানে গায়ের রঙ দিয়ে আর তাদের বিচার করা হবে না, বিচার করা হবে চরিত্রের গুণাবলী দিয়ে।

নিউ ইয়র্কে নিভৃতবাসে

সাগ্নিক দাস

তিন মাস। আজ এই অস্বাভাবিকতার তিন মাস পূর্তি হবে। মার্চ মাসের ১০ তারিখ, শেষবার নিউ ইয়র্ক শহরে গেছি। ১১ মার্চ থেকে আজ ১১ জুন, এমন এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেটেছে যার জন্য কোনো প্রকার প্রস্তুতি ছিল না। এই তিন মাস কীভাবে কাটিয়েছি যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলব, প্রথম দুই মাস মৃত্যু গুনে আর শেষ মাস বর্তমান পরিস্থিতিকে নব্য স্বাভাবিকতা ধরে নিয়ে জীবনকে আবার মূল স্রোতে ফেরানোর চেষ্টা করেছি।

ঠিক এই মুহূর্তে, বিশ্বে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৭৩ লক্ষ ৬০ হাজার। করোনাতে মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৬ হাজার। এই ৭৩ লক্ষ ৬০ হাজার আক্রান্তের মধ্যে, ২ লক্ষ ২০ হাজার শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে। আর ৪ লক্ষ ১৬ হাজার মৃতের মধ্যে ১৭ হাজার ১৯৩ জন নিউ ইয়র্ক শহরের অধিবাসী। বেশ কিছুদিন, বিশ্বের অন্য সমস্ত দেশের তুলনায়, করোনাতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার নিরিখে নিউ ইয়র্ক ছিল শীর্ষে। এখন অবশ্য অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে প্রথম প্রথম শুনতে পাই ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। চীনে যে এরকম একটা রোগ ছড়াচ্ছে, কাগজ, ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারি। তবে সত্যি বলতে, খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে, মানুষজনের মধ্যে একটু ভীত সন্ত্রস্ত ভাব অনুভব করছিলাম আস্তে আস্তে। বাসে, ট্রেনে, মাস্কধারি মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াতে লাগল। নিউ ইয়র্ক শহরে ও তার আশেপাশের কিছু এলাকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। মার্চ মাসের শুরুর দিকে কিন্তু লোকের মধ্যে সংক্রমণের ভীতি সম্পূর্ণভাবে প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছিল। বাসে, ট্রেনে, কেউ হাঁচলে বা কাশলে, ভয় ও বিরক্তি মিশ্রিত ভঙ্গিতে লোকে তাকাচ্ছিল। সমস্ত দোকান থেকে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিমেশে হাওয়া। হন্যে হয়ে খুঁজেও পাইনি। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিউ ইয়র্কের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা যখন প্রায় ৫০০ ছুঁই ছুঁই, সেই সময় সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় নিউ ইয়র্ক সরকার। অগত্যা ১১ মার্চ থেকে আজ অবধি বাড়িতে আছি। স্কুল, কলেজ বন্ধ করলেও, সমস্ত কিছু বন্ধ হতে আরো এক সপ্তাহ সময় নিয়েছে এখানকার সরকার। মার্চের ২০ তারিখ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানপাট ও অফিস বাদে, সমস্ত কিছু আসে লকডাউনের আওতায়। যেই শহরকে বলা হয় বিনিদ্র নগরী, সেই শহর জুড়ে নেমে আসে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। শুধু রাজপথ ধরে ধেয়ে চলে এম্বুলেন্স ও পুলিশ, দমকলের গাড়ি।

এই লকডাউনের পরে শুরু হয় এক বিভীষিকাময় দিন। রোজ শুধু মৃত্যুমিছিল, ও সংক্রমণের ভয়াবহ সব খবর। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। একটা সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে যেতেও ভয় লাগছিল। বসন্তের সময় সেন্ট্রাল পার্কে গোলাপি রঙের চেরি ফুলের জায়গায় দেখা মিলেছে সাদা তাঁবুর, অস্থায়ী হাসপাতালের।

সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই এই পরিস্থিতিতেও মনে প্রশ্ন জাগে। এই যে এত মানুষ করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন, এত মানুষ মারা যাচ্ছেন, এঁরা কারা? এঁদের আক্রান্ত হওয়ার বা মারা যাওয়ার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? সেই সময়, নেট জগতে একটি প্রচার চলছিল লোকের মুখে মুখে। প্রচারটির মূল বক্তব্য যে করোনা বড়োলোকের রোগ আর তাই জন্য এত হই হল্লা। কিন্তু সত্যি কি করোনা ধনী, ক্ষমতাবানদের রোগ? তাই জন্যই কি গোটা অর্থব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে রাখার পরিকল্পনা? আমেরিকার ক্ষেত্রে অন্তত কিন্তু এই কথা খাটে না। কেন খাটে না, তার উত্তর আছে নিচের দুই চিত্রে। চিত্রগুলি নেওয়া হয়েছে মিলেনা অ্যাল্ম্যাগ্র ও এঞ্জেলো হ্যাচিসানের সদ্য প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র থেকে।

প্রথম চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে, নিউ ইয়র্কের পিনকোড অনুযায়ী এলাকা ভিত্তিক জনসংখ্যার সঙ্গে করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্পর্ক। প্রথম চিত্রটির, প্রথম সারিতে যদি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন, যেই এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গ বা

হিস্প্যানিকদের বসবাস বেশি, সেই এলাকায় করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেই এলাকার মোট জনসংখ্যায় কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিকদের ভাগ বেশি, সেই এলাকায় তত বেশি করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। প্রথম চিত্রের, দ্বিতীয় সারির শেষ চিত্রলেখাটি মধ্যমা আয় ও করোনা আক্রান্তের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। চিত্রটি থেকে স্পষ্ট যে মধ্যমা আয় ও এলাকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক।

চিত্র ১: করোনা আক্রান্ত ও জাতি এবং আয়ের মধ্যে সম্পর্ক

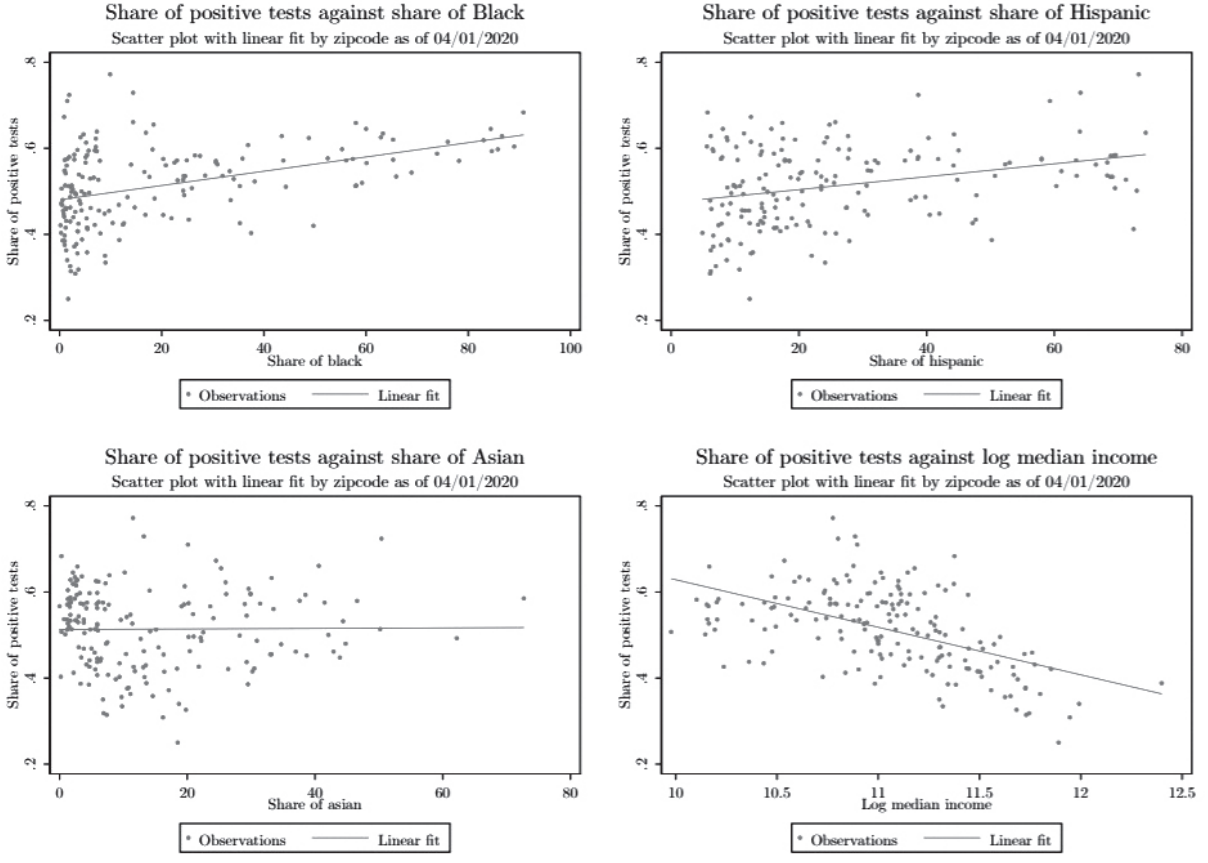

তাহলে সহজভাবে বললে, প্রথম চিত্রটি থেকে আমরা যা পেলাম :

(১) নিউ ইয়র্কের যেই সমস্ত এলাকায় মোট জনসংখ্যার মধ্যে, কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিকদের অনুপাত বেশি, সেই এলাকায় করোনার প্রকোপ বেশি। কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিকদের তুলনায়, যেই সমস্ত এলাকায় এশিয় অধিবাসীদের জনসংখ্যার ভাগ বেশি, সেইসব এলাকায় করোনার প্রকোপ তুলনামূলকভাবে কম। কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্প্যানিক, দুই ক্ষেত্রেই করোনা আক্রান্ত ও জনসংখ্যার ভাগের সম্পর্কটি ধনাত্মক, অর্থাৎ যেই এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিকদের সংখ্যা বেশি সেই এলাকায় করোনা সংক্রমণের সংখ্যাও বেশি। কিন্তু এশিয়দের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ও করোনা সংক্রমণের মধ্য কোনো সম্পর্ক নেই।

(২) যেই সমস্ত এলাকায় ধনীদের বসবাস বেশি, সেইসব এলাকায় করোনার প্রকোপ কম।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, করোনা ও বর্ণের সম্পর্ক বা করোনা ও আর্থিক শ্রেণির সম্পর্ক কি শুধুমাত্রই কাকতালীয়? প্রথম চিত্রটি দেখে এই সম্পর্কগুলি কাকতালীয় নাকি এঁদের মধ্যে কোনো কার্যকরণ সম্পর্ক আছে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এই প্রশ্নের উত্তর আছে দ্বিতীয় চিত্রটিতে।

মিলেনা আল্ম্যাগ্র ও এঞ্জেলো হ্যাচিসান দ্বিতীয় চিত্রটিতে দেখিয়েছেন করোনার সঙ্গে, বিভিন্ন ডেমোগ্রাফিক (জনসংখ্যা সম্পর্কিত) ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না। যেমন দ্বিতীয় চিত্রের, প্রথম সারির, একদম প্রথম চিত্রলেখাটি দেখেন, তাহলে দেখবেন, ১ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত, এই প্রত্যেকদিনের করোনা আক্রান্তের সঙ্গে,

মধ্যমা আয়ের রেগ্রেশান গুণাঙ্ক, ধারাবাহিকভাবে শুন্যের নিচে। এর অর্থ আয়ের সঙ্গে করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্পর্ক নেতিবাচক। অর্থাৎ, আয় কম হলে, করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আবার যদি দ্বিতীয় চিত্রের, দ্বিতীয় সারির, দ্বিতীয় ও অন্তিম চিত্রলেখাটি দেখেন, তাহলে দেখবেন, কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্প্যানিক অধ্যুষিত এলাকা হওয়ার সঙ্গে, ধারাবাহিকভাবে করোনা আক্রান্ত ও কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিক অধ্যুষিত হওয়ার রিগ্রেশন

পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কাজে যেতে হয়েছে। তাদের বাড়িতে বসে মাইনে পাওয়ার মতন বিলাসিতা করবার সুযোগ নেই। গণপরিবহণ কর্মী থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানের কর্মচারী। স্বাস্থ্যব্যবস্থা কর্মী থেকে হাসপাতালের ক্যানটিনের কর্মচারী। এই কাজগুলি সচরাচর কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিকরাই করে থাকেন। সুতরাং, সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এঁদের বেশি।

(২) দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ স্বাস্থ্য। যেহেতু কৃষ্ণাঙ্গ বা

চিত্র ২: বিভিন্ন এলাকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ও আর্থ সামাজিক অবস্থার সম্পর্ক

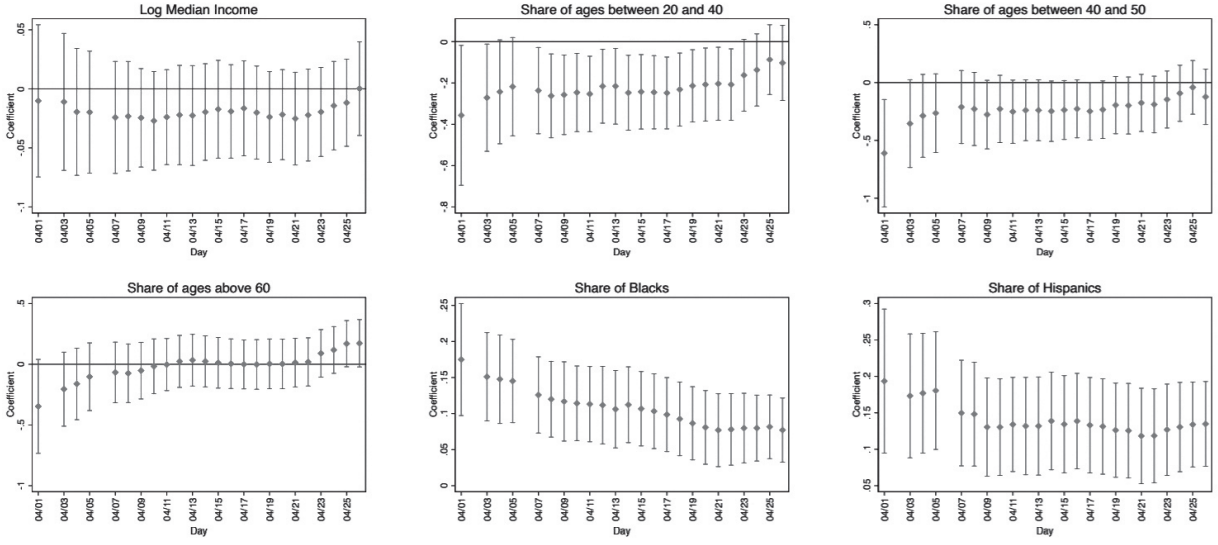

গুণাঙ্ক শূন্যের ঊর্ধ্বে। এর অর্থ, কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিক অধ্যুষিত অঞ্চল হলে, করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বর্ণের সঙ্গে করোনা আক্রান্ত হওয়ার যেই কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে, সেটি ধনাত্মক।

প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র থেকে আমরা নির্ধারণ করতে পারি যে কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিক অধ্যুষিত অঞ্চলে করোনার প্রকোপ বেশি। এবং গরিব এলাকায় করোনার প্রকোপ বেশি।

ঐতিহাসিকভাবে, নিউ ইয়র্কের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্প্যানিক অধ্যুষিত। সুতরাং, যেই সমস্ত আর্থিকভাবে পিছিড়ে পড়া এলাকায় করোনার প্রকোপ বেশি, সেই সমস্ত এলাকাগুলি কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্প্যানিক অধ্যুষিত। এখানেই পরবর্তী প্রশ্ন আসবে, এটা কেন? সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এর দুটো সম্ভাব্য কারণ বলতে পারি :

(১) অধিকাংশ সময়, কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিকরা এমন পেশার সঙ্গে যুক্ত, যা প্রয়োজনীয় পেশা হিসেবেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আগেই লিখেছি, সম্পূর্ণ লকডাউন হলেও, প্রয়োজনীয়

হিস্প্যানিকরা আর্থিকভাবে পিছিয়ে, তাঁরা ছোটো থেকেই পর্যাপ্ত পুষ্টি থেকে বঞ্চিত। অর্থাভাবে, এঁদের খাদ্যাভ্যাস শুধুমাত্র পুষ্টি বর্জিতই নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারকও বটে। যার ফলে এঁদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের উপসর্গ রয়েছে। যেমন ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেশার, ইত্যাদি। বিজ্ঞানসম্মতভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, এই প্রকার উপসর্গ শরীরে থাকলে, করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি। আর এই কারণেই, কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্প্যানিকদের মধ্যে করোনা থেকে মৃত্যুর হার, তুলনামূলকভাবে বেশি।

উপরে আলোচিত গবেষণা থেকে যেটি শিক্ষণীয়, একজন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তির ও একজন আর্থিকভাবে এগিয়ে থাকা ব্যক্তির করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান নয়। অন্তত নিউ ইয়র্ক শহরে তো নয়ই। আর্থিক বৈষম্য, বর্ণ বৈষ্যম্যের উপর নির্ভরশীল সমাজ ব্যবস্থা, অনেকাংশে নির্ধারণ করে দিচ্ছে কে করোনা আক্রান্ত হবে, এবং কে হবে না।

বর্তমানে সংক্রমণ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে, আস্তে আস্তে

লকডাউন তুলে নেওয়া হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক সরকার ৮টি অধ্যায়ে লকডাউন তোলার পরিকল্পনা করেছে। পরিকল্পনা মাফিক প্রথম অধ্যায়ের তারিখ ছিল ৮ জুন। আপাতত এই আংশিক লকডাউন শিথিল করার কারণে সংক্রমণ বাড়ছে কি না, সেসব দেখে নিয়ে পরের অধ্যায়ের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হবে।

জনগণ আবার ধীরে সুস্থে, স্বাভাবিক জীবনযাপনের দিকে ফিরছে। বর্তমান পরিস্থিতিকে নব্য স্বাভাবিকতা মেনে নিয়েই আবার জড়তা কাটিয়ে রাস্তায় বেরোচ্ছে, আন্দোলনও করছে। নিউ ইয়র্ক শহর সহজে হারে না। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে বিভিন্ন বাধা, বিপত্তি, অর্থনৈতিক মন্দা, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ সামলে, আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে এই শহর। গত তিন মাস যেই ঝড় বেয়ে গেছে এই শহরের উপর দিয়ে, সেই ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হত না, এই শহরের মানুষের হার না মানা মনোভাবকে বাদ দিয়ে। তবে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। প্রতিষেধক আসা অবধি, সজাগ, সচেতন থাকতে হবে। ভবিষ্যতে এই অতিমারি ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রবল। তবু আশা করা যায়, যেই মৃত্যুপুরী রূপ নিউ ইয়র্ক ধারণ করেছিল, ততটা খারাপ পরিস্থিতি আর হবে না।

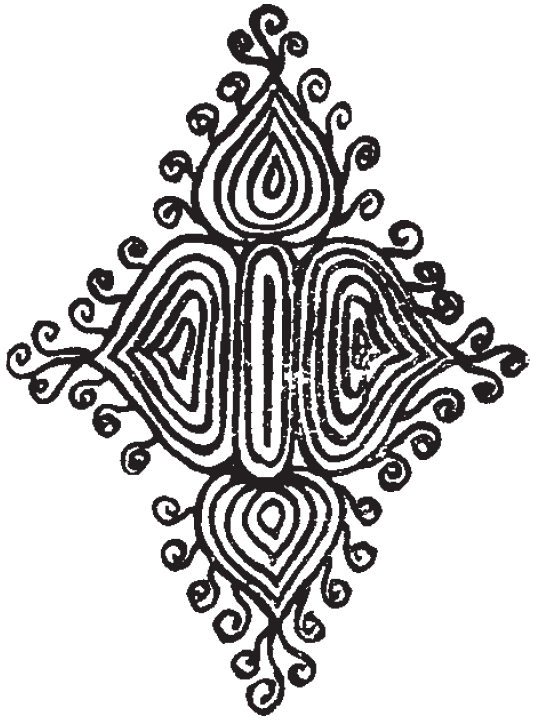

বাংলার উন্নয়ণের মিথ

সুখবিলাস বর্মা

২০০৮-এর নভেম্বরে আমলা জীবন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করার পর রাজনীতিতে যোগদান করি এবং ২০১১ সালে জলপাইগুড়ি আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করি। যেহেতু আমি প্রায় নয় বছর রাজ্য সরকারের অর্থবিভাগের বাজেট সেকশনে কাজ করেছি, প্রধানত সেই কারণে বিধানসভায় আমার সদস্য জীবনের প্রথম বাজেট অধিবেশন থেকেই বাজেট বিষয়ক আলোচনা বিতর্কে আমাকেই বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা মানস ভুঁইঞা, মহম্মদ সোহরাব এবং আবদুল মান্নান প্রত্যেকেই আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত সব বিষয়েই আমাকে বক্তৃতায় অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। তাই প্রতি বছর ফিনান্স বিল, সাপলিমেন্টারি বিল, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল ইত্যাদি বাজেট সংক্রান্ত সব বিষয়েই বিতর্কে অংশ নিয়েছি। ২০১১ থেকে ২০২০ এই নয় বছরে লক্ষ্য করেছি যে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যতটুকু কাজ করেছে, প্রচার করেছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। যে কাজগুলো করেছে তার অধিকাংশই দান-খয়রাতিমূলক স্থানীয় সম্পদ তৈরিতে নয়। অবশ্যই পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে বেশ কিছু ঘর-বাড়ি বড়ো বড়ো দালান তৈরি হয়েছে। এই কয়েক বছরে কলেজ তো ছাড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাই বেড়েছে অনেক, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৫০টি সরকারি ও সরকার পোষিত নতুন কলেজ এবং ৮টি নতুন সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও যুক্ত হয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের জন্য বিল্ডিং হয়েছে, রংচং করা হয়েছে। ওইসব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কত অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন তাদের গুণগত মান কী সেসব ভাবার সময় এখনও সরকারের হয়ে ওঠেনি।

একইভাবে রাজ্যে ইতিমধ্যে ৪০টি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, ৪০টির মধ্যে ৩৪টির ঘরবাড়ি তৈরির খরচ এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির দেওয়া রাজ্যের জন্য স্পেশাল বিআরজিএফ (ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়ন গ্রান্ট ফান্ড)-এর ৮৭৫০ কোটি টাকা থেকে। এই হাসপাতাল বিল্ডিংগুলোকে সেবার কাজে ব্যবহারের জন্য কত সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার নিয়োগ হয়েছে, কত নার্স নিয়োগ করা হয়েছে ইত্যাদি প্রশ্নে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সোজা উত্তর, ডাক্তার না পেলে কোথা থেকে নিয়োগ করব? তাই অধিকাংশ জায়গাতেই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নামে চলছে আউটডোর সার্ভিস। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, প্রয়োজনীয় অধ্যাপক এবং ডাক্তার নিয়োগ সম্ভব নয় জেনেও এই বিল্ডিংগুলি কেন করা হয়েছে? উত্তর অবশ্যই রয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সিন্ডিকেটের কথা, কাটমানির কথা তো বার বার প্রকাশ্যেই বলেছেন। জনসেবার নামে প্রচার এবং অর্থপ্রাপ্তি কী কম কথা? যে রাজ্যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলা মেডিকেল কলেজ চালানো যাচ্ছে না— সেখানে কোচবিহার, রায়গঞ্জ এবং অন্যান্য প্রত্যন্ত জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য তো জলের মতো স্বচ্ছ। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া ওই ৮৭৫০ কোটি টাকার মধ্যে ২৫০০ কোটি রাজ্যে বিদ্যুতায়ণ প্রকল্পে ১০০১ কোটি টাকা বাঁকুড়ার ১৪টি ব্লকে পানীয় জল প্রকল্পে খরচ করার কথা। ওই টাকা দিয়েই তৈরি সারেঙ্গার নবনির্মিত জলের ট্যাঙ্ক ধসে পড়েছে এবং সেই কন্ট্রাক্টরকে আরো তেরো কোটি টাকার কাজ দেওয়ার সুপারিশ করেছে ডিপার্টমেন্টাল টেন্ডার কমিটি। জয় সিন্ডিকেট বাজির জয়। মুখ্যমন্ত্রীর আশ-পাশে থাকা নেতা-নেত্রী ভাই ভাতিজাদের জয়। তোলাবাজির জয়।

উপরে বর্ণিত বাস্তবকে মাথায় রেখে এবারে আমি বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে আগামী বছরের বাজেট নিয়ে বিতর্কের কিছু সারকথা এখানে তুলে ধরব।

এবছরে প্রোগ্রাম ছিল যে বিধানসভায় বাজেট পেশ করার পরে জেনারেল ডিসকাশন-এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর কয়েকদিন হাউস ছুটি থাকবে যে সময়ে বিভিন্ন কমিটি বিভাগীয় বাজেটের প্রি-বাজেট স্ক্রুটিনি করে তাদের সুপারিশ দেবে এবং মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রধান প্রধান বিভাগের বাজেট

আলোচনা করে ৩১ মার্চের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট আলোচনার পর অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল পাশ করা হবে।

প্রোগ্রাম মতো ১৩ এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি জেনারেল ডিসকাশন হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিতর্কে অংশ নিয়ে আমি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরি। প্রথমেই উল্লেখ করি রেভিনিউ ডেফিসিটের কথা। উল্লেখ্য যে রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত কয়েক বছর ধরে রেভিনিউ ডেফিসিট বাজেটের অঙ্কে ধরছেন জিরো। ২০২০-২১-এর বাজেটেও তিনি রেভিনিউ ডেফিসিট জিরো ধরে নানা প্রোগ্রামের কথা নতুন পুরোনো অনেক কাজের কথা বলেছেন। কিন্তু গত কয়েক বছরের ট্রেন্ড (Trend) থেকে ধরে নেওয়া যায় যে ২০২০-২১ আর্থিক বছরে প্রকৃত রেভিনিউ ডেফিসিট হবে কম পক্ষে দশ হাজার কোটি টাকা। ২০১৭-১৮-তে জিরো বাজেটের জায়গায় প্রকৃত রেভিনিউ ডেফিসিট হয়েছিল ৯৮০৬.৯৭ কোটি ২০১৮-১৯-এ জিরোর জায়গায় প্রকৃত হয়েছে ১০৩৯৮.৬৬ কোটি, ২০১৯-২০-তে জিরোর জায়গায় রিভাইস্‌ড্‌ হয়েছে ৬১৭১ কোটি। তাই ২০২০-২১-এ দশ হাজার কোটির কম হবে না। তাই অর্থমন্ত্রী ঘোষিত বহু প্রোগ্রাম রূপায়ণ করা সম্ভব হবে না। বিশেষত অর্থমন্ত্রী যে ৫১৬৫ কোটি টাকার নতুন কাজের কথা বলছেন, সেই কাজগুলি করা সম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জিরো ডেফিসিট বাজেট নিয়ে অনেক বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য শুনতে হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সরকারের অর্থমন্ত্রীও একই পথে হেঁটেছেন। ড. দাশগুপ্তের পছন্দ ছিল জিরো ডেফিসিট বাজেট, ড. মিত্রের পছন্দ জিরো রেভিনিউ ডেফিসিট।

এর পরেই প্রশ্ন তুলেছি অতিরিক্ত কর বাবদ ৫০০ কোটি টাকা আদায় নিয়ে। অর্থমন্ত্রী এই অঙ্কটি দেখিয়েছেন হিসেবের মধ্যে কিন্তু কোনো কর প্রস্তাব বাজেটে রাখেননি। বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক কিছু ছাড় দিয়ে কিছু আদায়ের কথা অবশ্য বাজেট বক্তৃতায় রয়েছে। কর আদায়ের ব্যর্থতা সরকার এভাবে ঢাকতে চেয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে কতটা আদায় হবে কেউ জানে না। তাছাড়া সেই আদায় তো হবে ২০২০-২১ সালে নয়, প্রধানত ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে।

১৫.২.২০২০ তারিখে অর্থমন্ত্রী আমার এই প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর না দিয়ে, রেভিনিউ ডেফিসিট, অতিরিক্ত কর আদায় নিয়ে কোনো কথা না বলে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দেওয়া ডেফিসিট গ্রান্ট নিয়ে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমরা বুঝলাম, কতটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন আমাদের অর্থমন্ত্রী। কোন কথার কী উত্তর হয় সেটাও ঠাহর করতে পারছেন না তিনি। আসলে, মিথ্যা বলার সীমা ছাড়িয়ে ফেলেছে এই সরকার।

এরপর রাজ্যের নিজস্ব কর আদায় এবং কর বহির্ভূত অর্থ আদায় নিয়ে কথা বলতেই হয়। প্রতিবছর অর্থমন্ত্রী ২০১১ সালের আদায়ের সঙ্গে বর্তমানের আদায়ের তুলনা করে গর্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু বর্তমান বছরগুলিতেও যে এই রাজ্যের কর মোট আয়ের অনুপাত (Tax-GSDP ratio) অন্য রাজ্যগুলির চেয়ে অনেক কম, সে বিষয়ে নীরব থাকেন। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি নারাজ। কর-বহির্ভূত অর্থ (Non-tax revenue) আদায়ে এই রাজ্য যে সামান্যতম উন্নতি করতে পারেনি, সেকথা অবশ্য তিনি দু-একবার স্বীকার করেছেন।

প্রশ্ন আসে কেন্দ্রীয় করের প্রাপ্যাংশ (Share in Central Taxes) কেন্দ্র থেকে প্রাপ্য অনুদান (Grants from the Centre) নিয়ে। এই দুটি ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কমে গেছে বলে অর্থমন্ত্রী এবং রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই চিৎকার চেঁচামেটি করেন। তাই বাজেটে দেখানো অঙ্ক ধরে ধরে বলি যে ২০১৯-২০-এর উপরে ২০২০-২১-এ বৃদ্ধির হার রাজ্যের নিজস্ব করের ক্ষেত্রে যেখানে ৭.৬, সেখানে কেন্দ্রীয় করের প্রাপ্যাংশের হার ১১.১ এবং কেন্দ্রীয় অনুদানের হার ১২.৬। এমনকী জিএসটি ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ২০১৮-১৯-এর প্রকৃত ১৯৭৭ কোটি থেকে ২০১৯-২০-এর রিভাইসড ২৫৪৪ কোটি এবং ২০২০-২১-এর বাজেট ৪৯২৮ কোটি। প্রশ্ন রাখি, কেন্দ্র থেকে করের অংশ, অনুদান, ক্ষতিপূরণ সবক্ষেত্রেই কমেছে নাকি বেড়েছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর স্বভাবতই অর্থমন্ত্রী মহোদয় সযত্নে পরিহার করেন। এরপর নির্দিষ্ট দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরি সরকারের কাজের মিথ্যা ফিরিস্তিকে চ্যালেঞ্জ করে। এই ধরনের একটি বড়ো মিথ্যা অর্থমন্ত্রী মহোদয় গত দু-বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০১৯-২০-তে তাঁর বক্তব্য ছিল যে 'বাংলার আবাস যোজনা' প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ওই বছরের জন্য ১০৮০ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে ৫৮৬৭ কোটি টাকা ৫,৭৬,৩৫৫টি বাড়ির জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। উক্ত বছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে দেখিয়েছিলাম যে 'বাংলার আবাস প্রকল্প' নামে রাজ্য সরকারের কোনো প্রকল্প নেই এবং স্বভাবতই পঞ্চায়েত বিভাগের বাজেটে ওই টাকা ধরা নেই এবং কোনো কাজও হয়নি। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছাকৃতভাবে হাউসকে বিভ্রান্ত করেছেন এই মর্মে প্রিভিলেজ মোশন নিয়ে এসেছি।

তাঁর গত আর্থিক বছরের মিথ্যা দাবিকে তিনি এবারে আর একটু রং চড়িয়ে বলেছেন যে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে ৫,৮৫,৮৬৯টি মঞ্জুরিকৃত বাড়ির মধ্যে ৫,৫৬,৯০৩টি তৈরি হয়ে গেছে এবং বর্তমান বছরে ৮,১২,০৬৯ জন মঞ্জুরিকৃত উপকৃত ভোক্তার (beneficiaries) মধ্যে ইতিমধ্যে ৭,৫৪,০৭৪ জন ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ মধ্যে কমপক্ষে প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে

গেছেন। পঞ্চায়েত বিভাগের বাজেটে কোথাও 'বাংলার আবাস যোজনা' নামক কোনো গৃহনির্মাণ প্রকল্পের অস্তিত্ব নেই এবং অর্থমন্ত্রীর এ সংক্রান্ত পুরো দাবিটাই অসত্য এই কথা জানিয়ে বিভাগের বাজেটের সংক্ষিপ্তসার মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে পেশ করি এবং অর্থমন্ত্রীকে পুরো বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করি।

মন্ত্রী মহোদয় এবারে যে উত্তর দিয়েছেন তাতে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। হাউজিং বিভাগের বাজেট বরাদ্দ অনেক কমে গেছে তার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'গীতাঞ্জলি প্রজেক্ট যেটা হাউজিঙের মধ্যে ছিল has been merged with বাংলা আবাস যোজনা যেটা স্যারের (সুব্রত মুখার্জিকে দেখিয়ে) পঞ্চায়েত অর্থাৎ P & RD-এর বাজেটে চলে গেছে। This is the first explanation the second explanation "বাংলার বাড়ি" scheme has gone to ফিরহাদ হাকিমের কাছে Urban Development মিনিস্ট্রিতে... It is simply a movement of Gitanjali'।

আগেই বলেছি পঞ্চায়েত বিভাগে এই প্রকল্প এবং প্রকল্পের জন্য কোনো বাজেট ধরা নেই। হাউজিং বিভাগের 'গীতাঞ্জলি'-র বাজেট নগরোন্নয়ন বিভাগে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে চলে গেছে, সে কথাও ঠিক নয়। গীতাঞ্জলি প্রকল্পে ২০১৮-১৯-এর রিভাইসড-এ ছিল ৯০০ কোটি এবং ২০১৯-২০-এর বাজেট ছিল ৯১০ কোটি। সেই বাজেট ২০১৯-২০ সালের ২০২১-এ জিরো। নগরোন্নয়ন বিভাগের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের বাজেট মাত্র ২০ লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডাহা মিথ্যা বলেছেন। এ ধরনের মিথ্যা কথা বলেই এই সরকার প্রচার করে চলেছে বাংলার উন্নয়ন সম্পর্কে।

রাজ্য সরকারের আর একটি প্রকল্প 'সবুজ সাথী', সাইকেল বিতরণ যেখানে ২৪০০-২৫০০ টাকা দামের সাইকেল ৩৩০০-৩৪০০ টাকায় কেনা হয়েছে। প্রধানত কাটমানির জন্যই এই প্রকল্প। ২০১৯-এর মাঝামাঝিতে বিভাগীয় মন্ত্রীর উত্তর অনুসারে মোট সাইকেল কেনা হয়েছে ৭০ লক্ষ। কিন্তু সরকারের দাবি যে ইতিমধ্যে ১ কোটি সাইকেল দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন যে ২০১৯-২০-তে ১২ (বারো) লক্ষ সাইকেল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার জন্য বাজেট বা সাপ্লিমেন্টারি কি আছে? উত্তর মাত্র চল্লিশ টাকা। স্বভাবতই টিপ্পনি কেটে বলেছি যে, বারো লক্ষ সাইকেল কি সারদা, নারদা কোম্পানির মতো নতুন কোনো 'যশোদা' কোম্পানি থেকে পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস?

মোট কথা মিথ্যার রং চড়িয়ে উন্নয়নের কথা বলা এই সরকারের একটা নিয়মিত অভ্যাস হয়ে গেছে।

'কন্যাশ্রী' প্রকল্পকে রং চড়িয়ে প্রচার করেছিল যে সারা দেশে এই ধরনের প্রকল্প কেবল তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই করেছে। তথ্য দিয়ে বিধানসভায় বার বার বলেছি যে কন্যাশ্রীর মতো Conditional Cash Transfer (CCT) প্রোগ্রাম ২০০৮-০৯ সাল থেকেই ১৫টি রাজ্যে চলছে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে এই প্রকল্প অনেক বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। ১৮ বছর পূর্ণ হলে আমাদের রাজ্যে একটি কন্যা পায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা)। কিন্তু উক্ত রাজ্যগুলিতে তারা পায় এক লক্ষ টাকা।

এমনি আরো বহু প্রকল্পকে রং চড়িয়ে প্রচার চলছে, রাজ্যের উন্নয়ন কত হয়েছে সেটা দেখানোর জন্য। প্রতি বছরের বাজেট আলোচনার বিষয়গুলি বিচার করলেই অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। এটাও পরিষ্কার হবে যে রাজ্যের মিডিয়াগুলোও কতটা নিস্পৃহভাবে এই সরকারের প্রচারে শরিক হয়ে উঠেছে।

রাজ্য সরকারের আর একটি বড়ো মিথ্যা রাজ্যের ঋণ (Outstanding loan) নিয়ে, যেখানে এই সরকার পুরো দোষটা চাপানোর চেষ্টা করছে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের উপর। ঋণের ব্যাপারেও একটা বড়ো ধাপ্পা চলছে। সময় সুযোগ হলে সে ব্যাপারে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

উন্নয়নের নব নির্মাণ

কবিতা রায়চৌধুরী

প্রথমে কলকাতার বিখ্যাত বাংলামাধ্যম স্কুল 'হিন্দু স্কুল', তারপরে 'যাদবপুর বিদ্যাপীঠ' এবং 'শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল, নদিয়া' এবং তারও পরে আরো তিরিশটি বাংলামাধ্যম স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। কলকাতার সর্বাধিক প্রচলিত সংবাদপত্র এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, স্বাগত করেছেন। অসংখ্য অভিভাবক-অভিভাবিকাও নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করেছেন এই ভেবে যে তাঁদের সন্তানেরা আধুনিক এবং উন্নয়নশীল পশ্চিবমাংলার যথার্থ সুসন্তান হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। পড়াশুনোর শেষে বিদেশের মাটিতে পা বাড়াতে আরো একটু সুবিধা হবে। কে জানে হয়তো-বা জগৎসভায় কোনো একটি আসন লাভের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করে মায়ের আঁচলের তলায় সুখনিদ্রায় দিনাতিপাত করতে হবে না, নিজের মধ্যে বিশ্বলোকের সাড়া পেয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যেতে পারবে বিপুলা পৃথিবীর যেকোনো স্থানে নিজের কর্মস্থান ও বাসস্থান খুঁজে নিতে। মা-বাবারা অনায়াসে একে অপরকে বলতে পারবেন, তোমার ছেলে কোথায় আছে? মন্ট্রিল? জানো, আমার মেয়েটা আছে সিডনিতে— অত দূরে, একা একা, খুব চিন্তা হয়। আর ঐন্দ্রিলাকে মনে আছে, রোগা ফরসা মতো মেয়েটা, কেমন একটু বোকা বোকা হাবভাব ছিল, সেও নাকি চিলি না মেক্সিকো কোথায় একটা থাকে, ভাবা যায়!

এভাবেই বড়ো হয়ে উঠছে আজকের প্রজন্ম, একবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমবাংলার বিশেষত কলকাতায় বসবাসকারী বাবা-মায়ের সন্তানেরা। ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং শিক্ষার প্রতি এক তীব্র মোহ এই বাবা-মায়েদের আচরণে লক্ষ করা যায়। এক সহকর্মী অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, কী করব, আমার হাসব্যান্ড কিছুতেই ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবে না। অগত্যা.... জানি না, ছেলের ভবিষ্যৎ কী হবে। অবস্থাটা আরো অসহনীয় লাগে যখন বাড়ির ড্রাইভার বা কাজের লোক বলে, কাকিমা, ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভরতি করলাম। অনেক খরচ, কিন্তু কী করব, যা দিনকাল, ওকে তো মানুষ হতে হবে, আমার মতো হোক চাই না। কিছু একটা করে তো খেতে হবে। আমার এক আত্মীয় আরো একটু অগ্রবর্তী হয়ে বলেছেন, বাংলা পড়ে কী হবে? মেয়েকে তাই প্রথম ভাষা ইংরেজি, দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি আর তৃতীয় ভাষা ফ্রেঞ্চ পড়াচ্ছেন। বাংলা নৈব নৈব চ। বাংলার তো কোনো ভবিষ্যৎ-ই নেই! মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে অব্যক্ত যন্ত্রণায়। অত্যন্ত আহত বোধ করি বাংলা ভাষা, আমাদের মাতৃভাষার প্রতি এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অনাদর-অবহেলায়। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের হাতে প্রাণ আর রবীন্দ্রনাথের হাতে রূপ পাওয়া এই ভাষাটি পৃথিবীর সমস্ত দেশে আদৃত হয়েছে, আজও হচ্ছে। শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের একদল বাবা-মায়ের কাছে যেন এই ভাষার কোনো সমাদর নেই। তাঁদের ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্ন 'কী হবে বাংলা পড়ে'?

হিন্দু-হেয়ার কলকাতার বুকে প্রথম পাঁচটি বিশিষ্ট বাংলা মাধ্যম স্কুলের অন্যতম এ বিষয়ে সাধারণ বাঙালি নিশ্চয়ই একমত হবেন। বছরের পর বছর বহু কৃতী ছাত্র এই স্কুল দুটি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের অনেককে আমরা জানি, অনেককেই সেরকমভাবে চিনি না। কিন্তু মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পর এই স্কুলগুলির কতসংখ্যক ছাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং সামগ্রিক ফলাফল কীরকম হয় তার পরিসংখ্যান অনায়াসলভ্য। সেই সব ছাত্ররা পরবর্তী জীবনে কতদূর সফল তা-ও খোঁজখবর নিলে জানা যায় বই কী। এই পরিসংখ্যান কখনোই আমাদের হতাশ করে না আর এই সমস্ত কৃতী ছাত্রছাত্রীরা কখনোই বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনো করার জন্য কোনো খেদোক্তি প্রকাশ করেন না। যেমন করেননি আমাদের সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ অমর্ত্য সেন। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে বাংলা মাধ্যমেই তাঁর স্কুলশিক্ষা। আর বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ কোনোভাবেই তাঁর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

অন্য স্কুলগুলির কথা থাক, একটু নিজের স্কুলের কথা বলি। প্রথম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি— দীর্ঘ এগারোটা বছর যে স্কুলে পড়াশুনা করেছি, আমার এবং আমার মতো আরো অনেকের শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি হয়েছে যেখানে— যাদবপুর বিদ্যাপীঠ। ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠন চালু হওয়ার তালিকাবদ্ধ স্কুলগুলির প্রথমদিকেই আছে এই স্কুলটির নাম। হিন্দু-হেয়ারের মতো পুরোনো নয় স্কুলটি, স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের তত্ত্বাবধানে। ১৯৭১ সালে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা (স্কুলটিতে সহশিক্ষা প্রচলিত) প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে পরীক্ষা দেয়। ১৯৭৪ সালের বোর্ডের পরীক্ষায় (এগারো ক্লাসের উচ্চমাধ্যমিক) প্রথম দশ জনের মেধাতালিকার মধ্যে এই স্কুলের ছাত্র অভিজিৎ গুপ্ত স্থান করে নেয়। এরপরে ধারাবাহিকভাবে প্রায় প্রত্যেক বছরই এক বা একাধিক ছাত্র বা ছাত্রী মেধাতালিকায় প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে, সামগ্রিক ফলও হয়েছে অত্যন্ত উচ্চমানের। গত ষাট-বাষট্টি বছর ধরে স্কুলটি বাংলা মাধ্যমেই শিক্ষাদানের পথ নিয়েছিল, যদিও এর মধ্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে, এগারোর উচ্চমাধ্যমিকের পরিবর্তে (দশ+দুই) ব্যবস্থা এসেছে, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি পঠনপাঠন তুলে নেওয়া হয়েছে আবার চালু করা হয়েছে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া নিয়ে নানা বিতর্কের অবতারণা হয়েছে কিন্তু স্কুলটিতে পঠনপাঠনের মান এবং শিক্ষাপদ্ধতির মুনশিয়ানার একই উচ্চতা বজায় থেকেছে। স্কুল থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা বহুক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা বাংলা তাঁদের জীবনে উন্নতির পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বলে শোনা যায়নি বরং সহায়তাই করেছে।

এহেন স্কুলটিতে ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠনের সিদ্ধান্ত কেন? একটু ভেবে দেখা যাক। ত্রিমুখী চাহিদা এর কারণ হয়ে থাকতে পারে— এক, অভিভাবক-অভিভাবিকারা চান তাই; দুই, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চান সেইজন্য এবং তিন, রাজ্য সরকার চান, অগত্যা...। এই তিনটি চাহিদার সহাবস্থান অথবা যেকোনো একটি বা দুটি চাহিদারও ফলশ্রুতি হতে পারে এই সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে, তাই একথা ভেবে নিতে কোনো দ্বিধা নেই যে সরকারই নিয়ামক অর্থাৎ সরকারি 'অনুপ্রেরণা'-তেই স্কুলগুলোতে ইংরেজি মাধ্যম চালু হতে চলেছে। এটাকে কি উন্নয়নের একটা পদক্ষেপ বলেই সরকার মনে করছেন এবং আমরাও কি তা-ই ধরে নেব? অমর্ত্য সেনের পরিভাষায় Development as Capability Expansion? সুযোগ প্রসারের পথে উন্নয়ন? যদি বেশি সংখ্যক বিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠনের সুযোগ প্রসারকে উন্নয়নের সূচক বলে আমরা ধরে নিই বা মেনে নিই তা হলে অন্যান্য যুক্ত রাশিগুলোকেও (other related parameters) আমাদের হিসেবে নিয়ে আসতে হবে, দেখতে হবে, দেখতে হবে পরিবর্তনের অভিঘাতে যুক্ত রাশিগুলোর স্থিতাবস্থা বজায় থাকছে কি না।

কী সেই রাশিগুলি? প্রথম রাশি হিসেবে আমরা আলোচনা করব ব্যবহৃত ভাষাগুলির জনঘনত্ব ও বিন্যাস নিয়ে। ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রদেশগুলো ভাগ হয়েছে প্রধানত ভাষার ভিত্তিতে। প্রত্যেকটি প্রদেশের একটি প্রধান বা মূল ভাষা আছে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের উপর দায়িত্ব বর্তায় সেই ভাষাটির উন্নতি এবং প্রসার ঘটাবার।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মূলত বাংলাভাষী যদিও বাংলা ছাড়া নানা ভাষাভাষীর বাস এই প্রদেশে, চর্চা হয় বহুবিধ ভাষার। এই ব্যাপারে কোনোরকম সীমা নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়োজন লক্ষিত হয় না। মূল ভাষাটির রক্ষণাবেক্ষণ, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের চিন্তা রাজ্য সরকারকে করতে হয়, ভাষার চর্চা-উন্নতি-প্রসার সমস্তকিছু তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সরকারের। ভাষার কোলেই গড়ে ওঠে রাজ্যের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি। এই প্রসঙ্গে 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' এই আপ্তবাক্যটি ভুলে যাওয়া অনুচিত বলে বোধ হয়। বহুবিধ ভাষার মাঝখানে মাতৃভাষাকে যথোচিত মর্যাদা দানের বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়লে চিন্তার ক্ষেত্রে, মননের বহিঃপ্রকাশে বিপন্নতা বৃদ্ধি পায় একথা মানতেই হবে। সাধারণ মানুষ ইংরেজি মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের পড়াতে চাইছেন— এই জনপ্রিয়তার দাবি মেনে যদি উন্নয়নের পথনির্দেশ করা হয় সেক্ষেত্রে ইংরেজি চর্চা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার চর্চা যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় সেটা দেখা প্রয়োজন। যুগপৎ ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার প্রসার এবং বাংলার চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা রাজ্যের পক্ষে একটি কঠিন অনুশীলন। এই অনুশীলনের পথ বেয়ে কী উন্নয়নের রথের চাকা অগ্রসর হতে পারে? প্রশ্ন থেকেই যায়।

দ্বিতীয় রাশি শিক্ষক নিয়োগ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক-পদ শূন্য পড়ে আছে। শিক্ষক নিয়োগের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও প্রার্থীরা নিযুক্ত হচ্ছেন না। বারে বারে সহশিক্ষক পার্শশিক্ষকদের আন্দোলন-অনশন ইত্যাদিতে প্রকট হচ্ছে নিয়োগ ব্যবস্থার ব্যর্থতা, অনিয়ম-বেনিয়ম। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বাংলা মাধ্যমে যে সমস্ত শিক্ষকেরা নিয়োজিত আছেন তাঁরা ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষকতায় যুক্ত হতে পারেন না, এর জন্য নতুন একদল শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন। ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠন প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকার শিক্ষক নিয়োগের

প্রশ্নটি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন তো? যদি এই পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে প্রকৃত কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় তা হলে উন্নয়নের দাবিকে মেনে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রের বাস্তব পরিস্থিতিটা যে অন্যরকম তা আমরা জানি। যে যে বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজি মাধ্যম চালু করার নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলিতে অত্যন্ত উচ্চমানের পঠনপাঠন হয়ে থাকে। ইংরেজি মাধ্যমের বিভাগ খুলে দেওয়া হল কিন্তু উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা হল না, অভাব রয়ে গেল। শূন্যপদে কোনোই নিয়োগ হল না তা হলে কিন্তু বিদ্যালয়গুলোর পঠনপাঠনের মান হ্রাস পাবে। উন্নয়নের তথাকথিত ধারণাটাও হবে ব্যাহত।

এই প্রসঙ্গে তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা হল চাহিদার ন্যায্যতা। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা, বাংলা ভাষাভাষীরা কেন চাইছেন ইংরেজি মাধ্যমকে সন্তানের শিক্ষার মাধ্যম করতে? কেন বর্তমান রাজ্য সরকার জনসাধারণের এই আপাত-অন্যায় চাহিদাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? আমাদের কাজকর্ম-ব্যবহারে তো মুখের ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম বাংলারই প্রয়োজন। ইংরেজি তো কাজের ভাষা। হ্যাঁ, একথা মানতে হবে যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি আমাদের প্রয়োজন। কারণ, দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বই খুব বেশি বাংলায় লেখা হয়নি। রাজ্য সরকার তো ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দানের কথা না ভেবে বাংলা ভাষায় আরো অনেক উচ্চশিক্ষার বই রচনায় উৎসাহ দিতে পারেন, পরিভাষা প্রণয়নে যত্ন নিতে পারেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের এ বিষয়ে নিযুক্তও করতে পারেন। সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার তাগিদে মাতৃভাষার প্রতি এই অবমাননাকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কী? চিন, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি অ-ইংরেজিভাষী দেশগুলো যারা জাতীয় স্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে তারা তাদের মাতৃভাষাকেই প্রাধান্য দিয়ে গৌরবের আসনে বসিয়েছে অন্য কোনো বিদেশি ভাষাকে নয়। তা হলে আমরা কেন আমাদের মাতৃভাষাকে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর পরিধির মধ্যে আটকে রেখে ইংরেজি ভাষার প্রসারে যত্নবান হব? এই অন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গি কি যথার্থ উন্নয়নের পরিপন্থী নয়?

জনগণ নির্বাচিত করে সরকারকে আর সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে জনগণের মৌলিক অধিকার এবং অন্যান্য চাহিদাগুলো পূরণের। কোনগুলি জনগণের প্রাথমিক চাহিদা এবং কোন প্রাথমিক চাহিদাগুলো পূরণ হলে রাজ্য একটি স্থির উন্নয়নের পথে পরিচালিত হতে পারবে তা রাজ্য সরকারকেই নির্দিষ্ট করতে হয়। জনগণের অন্যসব প্রাথমিক দাবিগুলো (কর্মসংস্থান, মূল্যমান হ্রাস প্রভৃতি) দূরে সরিয়ে রেখে হঠাৎ করে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে সাধারণ মানুষের মন জয়ের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া একটি চতুর এবং অভিসন্ধিমূলক পদক্ষেপ বলে বোধ হয়। পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি পঠনপাঠন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতায় বিরোধীমনস্ক জনসাধারণকে নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করার অভিপ্রায়ে যদি ইংরেজি মাধ্যমের পঠনপাঠনের সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সেটাও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। কারণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হলে সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদানের মান যে একই থাকবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। বিভিন্ন হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপনে আমরা জানতে পারছি যে, বেসরকারি উদ্যোগে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় গজিয়ে উঠছে নিত্যনতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। বাসস্ট্যান্ডে সাদা ফ্লেকসে জ্বলজ্বল করছে অধ্যাপক মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ, ফ্লেকসে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে, 'সরকারি উদ্যোগে প্রথম ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের প্রতিষ্ঠা'।— হ্যাঁ, এটাই তথাকথিত উন্নয়নের নব নির্মাণ। (পশ্চিম) বাংলার রাজ্য সরকার ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রসার ঘটিয়ে বাঙালি ও বাংলাভাষাকে কোন উন্নয়নের পথে চালিত করছেন জানি না। এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, বাংলা ভাষার মাথায় পরানো নোবেলজয়ের স্বর্ণমুকুট উন্নয়নের রথের ধুলোয় ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে না তো? উন্নয়নের এই দাবিকে তাই মেনে নিতে ভয় করে, কাঁপন লাগে শিরদাঁড়ায়, অস্তিত্বের সংকট ঘনায়মান বলে বোধ হয়।

হে হে হে হেঁ হেঁ হেঁ

ইমানুল হক

কী লিখব এই সময়?

সন্ধ্যা নামার আগে নীরবতার অবসান হবে, শেষ কাক ও শালিক বাসায় ফিরবে, তার জন্য ইতিউতি তাকাচ্ছে, যদি কেউ কোনো খাবার ফেলে বারান্দা বা জানালা থাকে। এখন আর ঝগড়া নেই, বিষণ্ন মায়াবী আলোয়। কোকিল আসবে এর পরে। বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক। সকাল থেকে অনেক ঝরেছে। এখন শান্ত। বিশ্রাম নিচ্ছে। বাজ ও মেঘের অভাবে। এ সময় সুন্দরবনে জলের তলায় থাকা ঘর বাড়ি থেকে বউ ছেলেমেয়েকে ত্রাণ শিবিরে রাত কাটাতে পাঠিয়ে থেকে যাবেন ঘরে প্রৌঢ় বা যুবক। সাপের সঙ্গে লড়াই। তার চেয়েও ভয়, যা আছে, তা যদি কেউ চুরি করে নেয় রাতের আঁধারে। বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ নেই। এটা তাদের বাঁচোয়া। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে আছে। হঠাৎ কারেন্ট এলে বেঘোরে প্রাণ যাবে। তাই দুপুরে জলে ডুবে থাকা ঘরবাড়ির লোক জলে না ডুবে থাকাদের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। এত বিদ্যুতের শখ। তোর দাদু ঠাকুদ্দা তো বিদ্যুৎ কী জানতোইনি।পাখা ছাড়া পাকা বাড়িতে ঘুম হচ্ছেনি।

এই ঝগড়া প্রত্যক্ষ করে এলে দিব্যদর্শন ঘটে। ঘটে নতুন বুদ্ধি ঢোকে।

১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন আমফান রাত অসহ্য মনে হয়নি, নেট সমস্যা সাংঘাতিক ছিল সপ্তাহখানেক, অভ্যাস হয়ে গেছিল, ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপহীনতা।

এখন ফেসবুক কত খাতা ভর্তি হিসেব আনে। ময়লা ফেলার গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে বৃদ্ধার লাশ। উত্তরপ্রদেশে। ১০০ দিনের কাজ শুরু হয়েছে বহুদিন পর। রোদে পুড়ে না খাওয়া বৃদ্ধ লুটিয়ে পড়েছেন। মৃত। কিন্তু সবাই মাটি কাটতে ও তুলতে ব্যস্ত। মজুরি মিলবে না।

ফেসবুকে সে সব ভাইরাল হবে না, কেন না, এটা কেরল বা পশ্চিমবঙ্গ নয়। রামরাজ্য উত্তরপ্রদেশ। আজ ১১ জুন রামমন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে। ৮ জুন বিহারে ঐতিহাসিক ভার্চুয়াল ভাষণ দিয়েছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৯ জুন পশ্চিমবঙ্গে। বাঁশঝাড়ে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে এলইডি টিভি। ১৪৪ কোটি টাকা খরচ। ৭২ হাজার এলইডি। চীনা উপাদানে তৈরি কিনা, মিডিয়া চুপ। ওদিকে লাদাখে চীনা অভিযান। দেশের ৬০ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। মিডিয়া লেখেনি। আড়াই কিলোমিটার পশ্চাদপসরণ হয়েছে নাকি!

তার মানে ঢুকেছিল। কিন্তু সেকথা লেখা বারণ। লিখলে দেশদ্রোহী অথবা কর্মচ্যুতি। মালিকের বিজ্ঞাপন বন্ধ। করোনা ছড়াতে দিয়ে গণতন্ত্র লক ডাউন। সংসদ বন্ধ। সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ। ভার্চুয়াল। গর্ভবতী হাতি মৃত্যু নিয়ে দিস্তে দিস্তে লেখা, গর্ভবতী গবেষিকা সফুরা জারগর জেলে, জামিন মেলেনি। ওঁর করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক। কিন্তু জেসিকা শর্মার খুনী মুক্তি পাবে।

প্রকাশ্যে রিভলভার নাচানো গুলি ছোঁড়া সঙ্ঘী যুবক জামিন পাবে। গৌতম নওলাখা, ভারভারা রাও, সুধারা পাবেন না। ৫০০ লোক আক্রান্ত হলে চার ঘণ্টার নোটিশে সম্পূর্ণ লক ডাউন, দু লাখ ৭৬ হাজারে নির্বাচনী প্রচার। এখন রাজনীতির সময়। ৫৩ কোটি টাকা দিয়ে ৫১ কোটিকে সাহায্য করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। হাস্যকর এসব ঘটনার চেয়ে বড়ো কে কী বলল, সে নিয়ে চর্চা।

আসুন নানা রঙের মুখোশ বিক্রি হচ্ছে, অনলাইনে অর্ডার দিই। অনলাইন শপিং খুলে গেছে। শপিং মলও।

কটা লোক সুন্দরবনে কী খেলো না খেলো সে নিয়ে কে ভাবে?

আহা কোকিল ছানাটি এসেছে গাছের ডালে, দেখি।

যাদব ছেলেটি গুলি খেয়ে মরে গেল মন্দিরে গিয়ে।

করোনা মাতার পূজায় গেলে মরতো না। শিব মন্দিরে কেন গেল? অনার্য শিব এখন আর্য হইয়াছেন!

রথযাত্রা কবে যেন?

২০২১-এর অন্য রথে খুব আমোদ হবে। খুব।

রামরাজ্য আসিয়া যাইবে, হেঁ হেঁ হে হে।

বাবার চিঠি

শমিতা বসু

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-এর জন্ম-শতবর্ষ এসে গেল। ১৯২০-সালের ১৭ জুন তাঁর জন্ম আর ২০০৩-এর ১৯ এপ্রিল তাঁর প্রয়াণ। তাঁর মেয়ে শমিতা বসুকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি প্রকাশ করে জন্মশতবর্ষে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি।

আমার বাবা মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনের বেশ কিছু বছর কাটিয়েছেন আমাদের হিন্দুস্থান পার্ক এবং গড়িয়াহাট রোডের চারতলা বাড়িতে। ওই বাড়িটি আমাদের তিন ভাই-বোনের জন্মকর্মের সাক্ষী। ওইটি বাবার পৈত্রিক বাড়ি। কোনোদিন লেখাপড়ার সূত্রে কলকাতার বাইরে তো যাইনি তাই চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের কোনো সুযোগ আমার হয়নি বাবা-মা-এর সঙ্গে। তবে ছোটোবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে একটা সখ্য আমার ছিল। পড়াশোনায় ভালো ছিলাম বলেই বাবার প্রিয়পাত্রী ছিলাম, না আমার দুর্দান্ত এবং অশান্ত স্বভাবের জন্যেই আমাকে একটু বিশেষ স্নেহ করতেন— তা আমার অজানা। না কি পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক চিরকাল সব জায়গায় ঠিক এইরকমই হয় না তাও আমার জানা নেই। মনে পড়ে ক্লাস এইটে ফরাসি বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লবের পাঠ নিয়েছিলাম মানুষটার কাছ থেকে। এমন চমৎকার তার ব্যাখ্যা যে নিজের চেষ্টায় একটা নিবন্ধ লিখে ফেললাম। বাবা দারুণ খুশি হলেন। ছাদে পায়চারি করে কবিতা নিয়ে ভাবতেন বাবা— কবিতার জন্ম দিতেন, তখন তাঁর কন্যা পাশে পাশে হাঁটত এবং নানা প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তুলত। এইভাবেই ভেতরে ভেতরে সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমার সঙ্গে— আমার ছিল সাত-খুন মাপ।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময়ে আমি বাবার জন্যে কেঁদে ভাসিয়েছিলাম এবং বাবার চোখেও জল দেখেছি। তারপর বেশ কিছু বছর কাটে আমার স্বামী প্রতীকের সঙ্গে নিউ আলিপুরের একটি ফ্ল্যাটে। এই নতুন অধ্যায়ে যোগাযোগ বহাল রাখার দায়িত্ব বাবা মঙ্গলাচরণই তুলে নিয়েছিলেন। তিনি তখন মস্কো-ফেরত। প্রগতি প্রকাশনে ছ-বছর কাজ করার পর প্রবাস জীবন-যাপন সম্পূর্ণ করে ফিরলেন ১৯৮০ সালে। তখন ‘কোথাও যাবার কথা ছিল’ কাব্যগ্রন্থের প্রস্তুতি চলছে। আমি অর্থনীতির ছাত্রী হয়েও ছবি আঁকতে শুরু করি। আবার নতুন করে শুরু হল আর এক পর্ব। আমি ছবি আঁকি— বাবা নিউ আলিপুরে আসেন— বাবা বই পড়েন। বই তো অন্যরকম কিছু না, হয় সেজান, না হলে গগাঁ বা ভ্যান গখ্। ওইসব শিল্পীদের রং চাপানো বা চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করতাম এবং ভীষণ উত্তেজক এবং রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের এই গাঢ় ভাবটা কিন্তু পরিবারের সকলের অজানা ছিল। এর কারণ একটাই। অত্যন্ত চাপা স্বভাবের মানুষ। ভালোবাসার প্রকাশ প্রায় ছিল না বললেই হয়।

এরপর ১৯৯১ সালে কলকাতার পাট চুকিয়ে বম্বে যেতে হল। বম্বের জীবনে নতুনত্বের রোমাঞ্চ ছিল, অন্যরকম একটা শহরের গন্ধ নেওয়া নিয়ে প্রথমটা রীতিমতো ব্যস্ততায় কাটল। তারপর একটা আড্ডাহীন নিঃসঙ্গতা চেপে ধরল আমায়। সেই সময় থেকেই বাবার আমাকে চিঠি লেখার সূত্রপাত।

১৯৯১ সালে আমাদের গড়িয়াহাটের বাড়ি বিক্রির কথাবার্তা চলছিল। ’৯২ সালে আমরা বম্বেতে থাকা অবস্থাতেই বাবা-মাকে আমাদের নিউ আলিপুরের বাড়িতে অধিষ্ঠিত করা হল। যদিও আমার দুই ভাই এবং অন্যান্য কিছু আত্মীয়স্বজনের যাতায়াত বহাল রইল ওই নতুন জায়গায়, তবু বড়োই সঙ্গীহীন হয়ে পড়েন বাবা মঙ্গলাচরণ এবং মা ঊর্মিলা চট্টোপাধ্যায়। বাবার কবিবন্ধুদের গড়িয়াহাটে নিরন্তর আনাগোনা ছিল। বিশেষ ঘনিষ্ঠরাও তেমনভাবে আসা-যাওয়া করতে পারতেন না নিউ আলিপুরে।

ওখানে থাকাকালে ১৯৯১ সাল থেকেই পরবাসী কন্যাকে চিঠি লেখার শুরু। প্রত্যেকটা চিঠির ছত্রে ছত্রে স্নেহ-ভালোবাসা ছাপিয়ে উঠেছে নানারকম দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা। আমার ছবি

আঁকার ব্যাপারে একদিকে যেমন উৎসাহ দেখাতেন, তেমনিভাবে বহু পরামর্শ আমার কানে পৌঁছে দিয়েছেন। আভাসে ইঙ্গিতে বলতে চাইতেন অনেক কথা। মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন তাঁর সরল কন্যাকে, কারণ আমার চিরকাল মানুষকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হওয়ার প্রবণতা ছিল ভীষণ। বাবা কলকাতার খবর, কাছের মানুষগুলোর অপ্রত্যাশিত ভালো এবং মন্দ সংবাদ, সবই অসাধারণভাবে আমাকে পত্রে জানিয়েছেন। এই পত্রসম্ভার আমার চরম পাওনা। পরম সম্পদ। অনেক স্থান পরিবর্তন হয়েছে বম্বে শহরে, যার ফলে কিছু চিঠিপত্র হয়তো আমার কাছে নেই। তার জন্য আমি সম্পূর্ণভাবেই দায়ী। হয়তো আমার জীবনে এই বিশেষ মানুষটির চিঠিপত্র যে কত অমূল্য সম্পদ তা বোঝার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। সে কারণে নিজের অপরাধ অমার্জনীয় বলে মনে হয়।

৬ মার্চ, ১৯৯২

খুকু মা,

তোমার মায়ের চিঠি লেখার ৬ দিন পরে আমি লেখার সময় পেলুম। এর আগে কত দিন লেখা-সংক্রান্ত কাজ ও সভা-সমিতি করে সময় গেল, তারপর এ-সপ্তাহের ক-টা দিন গেল বাড়ির নানা document পবন আগরওয়ালকে দেয়া-নেয়া এবং ওর দেয়া কাগজপত্রে নিজের ও বাড়ির সকলের সইসাবুদ করানোর ঝামেলায়। এছাড়া দৈনন্দিন বাজার এবং মাসের গোড়ায় মাসকাবারি একাধিক ধরনের বাজার ইত্যাদি প্রাত্যহিকতা তো আছেই। কী করে যে আমি এত 'কেজো' লোক হয়ে গেলুম কে জানে! তবে এর ফলে মনে হচ্ছে লেখা-টেখা বোধহয় ক্রমশ শিকেয় উঠবে।

এখন আমাদের জীবনে প্রধান সমস্যা হচ্ছে, তোমাদের— ছেলেমেয়েদের— কাছ থেকে দূরে সরে থাকা আর একা হয়ে যাওয়া। যে-ব্যাপারটা এই বয়সে আমাদের মনের দিক থেকে খুব একটা সুখপ্রদ না। অবশ্য শারীরিকভাবে একা থাকলে লেখার ব্যাপারে খানিক অবকাশের সুবিধে পাওয়া যায়, কিন্তু বয়সে মনের শূন্যতা সহজে ভরতে চায় না। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, বিশেষ করে তোমার মা শারীরিক দিক থেকে খানিক অশক্ত হয়ে পড়ায় প্রাত্যহিক সংসারযাত্রার (অর্থাৎ, বাইরের কাজকর্মের) প্রায় সমস্ত চাপটা আমায় বহন করতে হবে। এমন কি, বাড়ি বদল করার পর দৈনিক দুধ আনা, রেশন তোলা পর্যন্ত করা ছাড়া উপায় থাকবে না। ফলে মানসিক দিক থেকে কতখানি অবকাশ কপালে জুটবে কে জানে! তাই মনে হচ্ছে, শেষ বয়সে জীবনের একটা নতুন অধ্যায় আমাদের জীবনে শুরু হতে চলেছে।

তবে তুমি মা এসব ব্যাপার নিয়ে অনর্থক ভাবনাচিন্তা কোরো না। মানুষকে তার ভবিতব্যের ফলাফল ভোগ করতেই হয়। ভাবনাচিন্তা করে সেটা কেউ এড়াতে পারে না। তুমি মন দিয়ে তোমার ছবি আঁকা চালিয়ে যাও। তবে এখনও কিছুদিন বোধহয় তোমাকে commissioned কাজ করতে হবে, তাই না? কিন্তু ফরমায়েসি কাজের মধ্যেও যতটা সম্ভব তোমার নিজস্ব ভাবনা, তোমার বিশিষ্ট identity-কে জায়গা করে দিতে চেষ্টা কোরো। তা করতে পারলে তবেই পরে তোমার নিজস্ব ছবি করার তাগিদ বৃদ্ধি পাবে। আর আমি তোমার সেইসব ছবির প্রতীক্ষায় থাকব যখন তোমার আঁকা ছবি হয়ে দাঁড়াবে তোমারই গহন মনের ছবি আর বাইরের দৃশ্যমান জগৎটা হবে উপলক্ষ মাত্র, তোমার মনের, তোমার mood-এর প্রতীক বা symbol।

বছর-দুই আগে আমাদের এই প্রস্তাবিত বাড়িছাড়া নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলুম, নিচে সেটাই উদ্ধৃত করে চিঠি শেষ করি।—

কেন

এই বাড়ি যেতে হবে ছেড়ে।
চল্লিশ বসন্তবর্ষাগ্রীষ্মের গাঁথুনি ইটে ইট
নেপথ্য অনেক কথা দেয়া-নেয়া ফিরে-চাওয়া খসে-ধসে-পড়া পলস্তরা
কে এল কে গেল মনে-গড়াটুকু এখানে-ওখানে ছাতাধরা—
ছেড়ে যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে ছেড়ে সব
সমস্ত পেছনটাকে একেবারে তালাক দিয়ে
ফিরে না তাকিয়ে একবারও;
পেছন-জানলাগুলো শুধু রইবে বিস্ফারিত ফ্যালফ্যাল-চোখ
অবাক হাঁ-মুখ হাট সদর দরোজা
যেন বাসাভাঙা-মন শরীরখোলস স্মৃতি-জন্মদাগ পুষ্পবৃষ্টির আশ্রয়ছায়া ছেড়ে
উড়ে যাচ্ছে নিরুদ্দেশ অথবা নিকট-নীড়ে যে-কোনো বাসায়।

আকাশবিষাদে কেন ভিজে উঠছে সকালদুপুর
ভেতরে-ভেতরে গুমরে-গুমরে মেঘ
দূরের গুর্‌গুর
জীর্ণ বসনের মতো এই বাসা ছাড়া
এই নতুন সন্ধান
ছিঁড়ে যাচ্ছে পটপট কেন জন্মজট ক'টা নাড়ির বন্ধন
উন্মূলিত কয়েকটা শেকড়—
ছেঁড়ার আড়াল কেন রয়ে যাচ্ছে কেন
শেকড়ের অন্তর্লীন বিন্দু রক বিন্দু রস বিন্দু-বিন্দু আমি।

এই অন্তঃক্ষরণই এখন আমার মনের প্রতিবিম্ব! মা, তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, তোমাদের জন্যে যেন আমাদের দুশ্চিন্তা না বাড়ে। আমার আদর ও ভালোবাসা নিয়ো দু-জনে।

—বাবা

১. পবন আগরওয়াল আমাদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি কিনে নেন ১৯৯২ সালে এই বিশাল চারতলা বাড়ির ভাগীদার ছিলেন বাবারা ছয় ভাই, বাবাদের বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় চার ভাইবোন।

২. বাবা ও মার নিউ আলিপুর আসা হয়ে গেছে এবং নতুন সংসার গোছানোর ভারে বাবা কিছুটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আসলে শারীরিক কাজে বাবার বিশেষ রুচি কোনোদিনই ছিল না। আমাদের সংসারটা মা-ই চালাতেন পুরোপুরিই তাঁর অদম্য ক্ষমতা দিয়ে।

৩. 'কেন' কবিতাটি আমি এখানে তুলে ধরলাম কারণ ১৯৯২ সালে আমাদের গড়িয়াহাটের বাড়িতে দীর্ঘ ৪২ বছর থাকার পর, স্থানান্তরিত হতে গিয়ে মানুষটি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। এই 'কেন' কবিতাটি 'কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থে ২০০৬ সালে বেরিয়েছে।

নিউ আলিপুর
৫ নভেম্বর, ১৯৯২

কল্যাণীয়া খুকু-মা,

এর আগে তোমায় একখানা বড় চিঠি দিয়েছি, এতদিনে পেয়েছ আশা করি। আমার আর type করে তোমায় কবিতা পাঠানো হয়ে উঠছে না; প্রথমত এখানে-ওখানে আসা-যাওয়া আর হঠাৎ নানারকম meeting নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, দ্বিতীয়ত Remington Co. থেকে typewriter-টা এখনও বদলে দেয়নি।[১] তাছাড়া নিয়মিত চর্চার অভাবে type করাটায় আমি এখনও পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছি না। এই সব নানাবিধ কারণে type করার জন্যে আর অপেক্ষা না করে গোটা আষ্টেক কবিতা (ছাপা এবং হাতের লেখা মিলিয়ে) Xerox করে এই সঙ্গে তোমায় পাঠাচ্ছি। বাকি দু-তিনটে লেখা তুমি এখানে থাকতেই দেখে গিয়েছিলে, তাই সেগুলো আর পাঠালুম না।

কবিতাগুলো[২] তোমার কেমন লাগল অকপটে জানিও মা। সমালোচনা কিছু থাকলে সব খোলাখুলি জানিও, তাতে আমার উপকার হবে। লেখাগুলো থেকে টের পাবে আমি নিজেকে একটু-একটু করে বদলাবার চেষ্টা করছি। তাই তোমার মতামত জানতে চাই। আমার আদর ও শুভেচ্ছা।

—বাবা

১. নিউ আলিপুরে থাকতে আসার পর বাবা আমার স্বামী প্রতীকের কাছে একটা টাইপরাইটার চেয়েছিলেন। প্রতীকের এক বিশেষ বন্ধু Remington join করে। বাবা সেটা জানতেন এবং ঐ বন্ধুটির সঙ্গেও পরিচিতি ছিল। তাই এই বিশেষ আবদার। আমার স্বামী ওঁর ঐ বন্ধুর কাছ থেকে Remington-এর একটি typewriter কিনে বাবাকে উপহার দিয়েছিল। বাবার প্রথমে খুবই উৎসাহ ছিল type করে লিখবেন বলে। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে মঙ্গলাচরণ কোনোদিনই type করাটা ঠিক আয়ত্তে আনতে পারেননি। পারেননি কারণ হয়তো বাবার বয়স তখন ৭২ পেরিয়েছে। আর শরীরেও তখন ক্ষমতা ছিল না।

২. এইরকমভাবেই অনবরত আমাকে নতুন-লেখা পাঠাতেন এবং মতামত জানতে চাইতেন। কবে যে আমি তাঁর কবিতার সমালোচনার উপযুক্ত পাত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তা আমি নিজেই বুঝিনি। তবে এটা ঠিক যে আমি বাবার মন রাখার জন্যে কিছু বলতাম না। সহজভাবে সত্যি কথাটাই বলতাম। এটাই আমার সঙ্গে বাবার অসম্ভব মিল।

নিউ আলিপুর
২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

খুকু-মামনি,

তোমার দীর্ঘ চিঠি বেশ কিছুদিন হল পেয়েছি, কিন্তু কীভাবে কোথা থেকে যে শুরু করি তার জবাবটা বুঝে উঠতে পারছি না।

হ্যাঁ, প্রথমে তোমার কথা দিয়েই শুরু করি। তুমি লিখেছ, নিজের ছবির পরিকল্পনা করতে যতটা ভালো লাগছে শেষপর্যন্ত তার রূপায়ণ তত সুন্দর হবে কিনা সে-ব্যাপারে তোমার সন্দেহ আছে। কথাটা যে-কোনো শিল্পী বা লেখকের পক্ষে প্রযোজ্য এবং তা সত্যি হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। কেননা কোনো-কোনো সময়ে আসল কাজটা পরিকল্পনার চেয়েও ভালোভাবে উতরে যেতে দ্যাখা যায়। তোমার আঁকা ওই তিনটি ছবির ফোটোগ্রাফ এখনও পাইনি বলে এ-বিষয়ে দর্শক ও উপভোক্তা হিসেবে আমার মত এখনও দিতে পারছি না।

তুমি লিখেছ, 'এখনও আমার technical সমস্যা হয় ছবি আঁকতে গিয়ে'। এটা শুধু একা তোমার নয়, এ তো সব শিল্পী ও লেখকের সমস্যা, মা। এ-সমস্যা এখনও পর্যন্ত আমারও যে-সমস্যা। প্রতিবার লিখতে বসলে মনে হয় যেন জীবনে এই প্রথম কবিতা লিখতে যাচ্ছি। কাজেই এমন হলে নিরুদ্যম হবার কোনো কারণ নেই মা। ছবি আঁকাই বল আর লেখাই বল, কাজে বসতে হয় প্রথমটা রুটিন-মেনে-চলা আর drudgery স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে দিয়ে, তারপর কাজের সঙ্গে হৃদয়ের, হাতের সঙ্গে হৃদয়-মনও তাল মিলিয়ে চলে, আর একেই লোকে বলে inspiration। তবে কবিতা লেখার মতো ছোট আয়তনের কাজে হয়তো এই প্রাথমিক drudgery-র মাত্রা কম থাকে এবং পর পর গোটা দুই-তিন কবিতা লেখার পর অনেক সময় ভেতর-ভেতর একটা trance-এর মতো ভাব আসে। কিন্তু তোমাদের ছবি আঁকার

ব্যাপারটা একেবারে ভিন্ন। আঁকতে বসার প্রাথমিক প্রস্তুতিতেই অনেকটা সময় যায়, রঙ্-তুলি-ক্যান্ভাস সাজিয়ে বসা, তারপর মনে-মনে গড়ে-তোলা পরিকল্পনাটা শিল্পী চোখের সামনে অনেকখানি ফুটিয়ে রেখে তবেই খানিকটা নিশ্চিত হয়ে ছবিতে হাত দিতে পারে। এতেই এতটা সময় যায় এবং তারপর গোটা ছবিটা আঁকতে যে-পরিমাণ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হয় তাতে তারপর trance-এ ডুবে থাকা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। তবে কখনও-কখনও ও কারো-কারো ক্ষেত্রে শিল্পীকেও এই trance-এর ঘোরে এঁকে যেতে দ্যাখা যায়, যেমন ভ্যান গখ্, গোগ্যাঁ, ইত্যাদি। দ্যাখা গেছে, বিশেষ করে ভ্যান গখ্ তো খুবই দ্রুত ছবি আঁকতেন।

বছর তিন-চার কিংবা তারও আগে আঁকা তোমার এইরকম impression-ভিত্তিক ছবি (একটা জঙ্গলের ছবি) আজও আমার চোখের সামনে ভেসে আসে।[১] তখন কেন যেন আমার মনে হয়েছিল, ছবি-আঁকায় তুমি বুঝি পথ পেয়ে গ্যাছো। কিন্তু কই, তা তো হল না। হয়তে আমারই ভুল হয়েছিল, আমি একটু দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলুম। হয়তো এখনকার এই naturalistic ধাঁচে আরও খানিক practice-এর দরকার ছিল তোমার। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটা নিজস্ব technique আয়ত্ত করার পরিপার্শ্ব পৃথিবীকে নিজের মতো করে দ্যাখার আর উপলব্ধি করার নিজস্ব চোখ আর মন খুঁজে পেতে হবে তোমায়। তুমি খুব নামিদামি শিল্পী হবে, এ-স্বপ্ন আমি দেখি না মাগো; কিন্তু তুমি একজন সৎ শিল্পী হবে, এক্কেবারে নিজের-মতো-করে স্বকীয় ঢঙে নিজস্ব ছবি আঁকবে এইটেই আমার কামনা। সেটা কি বড্ড বেশি আশা করা, মাগো? নামিদামি শিল্পী হতে গেলে শিল্পীসৃষ্টির বাইরে নানা ধরনের manoeuvre করতে হয়, সেটা তোমার মতো মানুষের ধাতে সয় না, সইবে না। কিন্তু তোমার সাধ্যমতো (কেননা আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ক্ষমতা বা সাধ্যের একটা সীমা আছে) নিজের মনের-মতো-করে ছবি আঁকা কি সম্ভব নয়? অবশ্য তুমি যদি ছবিতে নিবিষ্ট হতে পার, তবেই। ভালো থেকো মা।

—বাবা

১. যে জঙ্গলের ছবিটার কথা বলেছেন সেটা হঠাৎ একটা হয়ে যাওয়া ছবি। এটা সম্পূর্ণভাবেই নিজের অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসা একটি প্রকাশ। এই যে বাবা লিখলেন— 'কিন্তু কই, তা তো হল না'— এটা একেবারে ঠিক কথা। আমার স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে আমার প্রকৃতিতে সেরকম ডুবে থাকা বা মগ্ন হয়ে পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট হয়ে থাকা বা কাজ করা খুব কঠিন। আমি বড়ো বেশি উচ্ছল হাসিখুশি একটি মেয়ে। সেই কারণেই বাবার আশা আমি পূর্ণ করতে পারিনি। অতিরিক্ত বর্হির্মুখিতা আমার ছবি আঁকার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমার যে যোগ্যতা বা সামর্থ্য ছিল না তা কিন্তু নয়। বাবা সেটা বুঝতে পারতেন। সমানে আমাকে সাবধান করেছেন। মানুষের সঙ্গে বাড়াবাড়ি মেলামেশা যে আমার কাজের বাধা হয়ে উঠেছিল বাবা জানতেন এবং বার বার তাঁকে আশাভঙ্গ করেছি, নিরাশ করেছি।

নিউ আলিপুর
১৪ জুলাই, ১৯৯৫

মাগো,

এই সঙ্গে সত্যজিৎ চৌধুরির পাঠানো ওঁর দুটি রবীন্দ্রনাথের ছবি-বিষয়ক প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি ইংরেজি প্রবন্ধ একসঙ্গে পাঠালুম। প্রতীকের এখানের অফিসের অভিজিৎ দাশগুপ্ত বম্বে যাচ্ছে, তার সঙ্গে লেখাগুলো পাঠাচ্ছি। তুমি তোমার সময়মতো ধীরেসুস্থে এগুলো পড়ে ধীরে-সুস্থেই তোমার মতামত জানিও। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু ছবির slide দেখতে পেলে বোঝার সুবিধে হোত, আমরা slide-এর সঙ্গেই সত্যজিতের প্রবন্ধ শুনেছিলাম। যাইহোক, তোমার মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের ছবি দ্যাখা আছে তো, বাড়িতে কিছু ছবির অ্যালবামও আছে নিশ্চয়। কাজেই বুঝতে খুব-একটা অসুবিধে হবে না।[১]

আশা করছি, এতদিনে তোমার ছবি আঁকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন চোখকে একটু বিশ্রাম দিয়ে লেখাপড়ার কাজ কোরো মা। চিঠি লেখার জন্যে ব্যস্ত হোয়ো না। টেলিফোনে তো কথা হয়ই।

তোমরা সুস্থ থেক, ভালো থেক মা।

—বাবা

১. মঙ্গলাচরণ রবীন্দ্রনাথের ছবির খুব অনুরাগী ছিলেন। যখন থেকে আমার ছবি আঁকার শুরু, বাবা রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে বলতেন। ওঁর মতে সে যুগে অতটা আধুনিকতা রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ছবিতে যেভাবে form ভেঙেছেন, আস্তে আস্তে abstraction বা বিমূর্তভাব আনতে পেরেছেন, বিশ্বের অন্য কোনো শিল্পীই সেটা এত সহজে অর্জন বা আয়ত্ত করতে পারেননি। Classical ধাঁচের ছবি যে আঁকে এবং সেখান থেকে বেরোনোর রাস্তা খুঁজছে, তাকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি দেখতেই হবে। সত্যজিৎ চৌধুরীর প্রবন্ধটি সত্যিই অনেক বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছে।

নিউ আলিপুর
৯ নভেম্বর, ১৯৯৫

কল্যাণীয়া খুকু-মা,

শিবানীর সঙ্গে আমাদের চিঠি এবং তিনখানা ছবির বই ও একখানা পত্রিকা— 'প্রতর্ক', নভেম্বর '৯৪-

জানুয়ারি '৯৫ সংখ্যা পাঠাচ্ছি। শিবানীর সঙ্গে ছবির বইগুলো পাঠানোর ব্যাপারে তোমার মায়ের আপত্তি ছিল। কারণ, বইগুলো নেয়ার ব্যাপারে শিবানী আমাদের এখানে আসেনি, জামাইকে পাঠাচ্ছে। তার ওপর কলকাতায় এখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই দু-জনের হাত বদলের ফলে ছবির বইগুলো নষ্ট হয়ে যাবে কিনা, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট ভয় আছে। কিন্তু বইগুলো পাওয়ার ব্যাপারে তোমার প্রবল আগ্রহ দেখে আমি অপেক্ষা না-করে শিবানীর সঙ্গেই বই পাঠাতে মনস্থ করেছি। আমাদের চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে বইগুলোর প্রাপ্তিসংবাদ জানিও, মা। ১৯৮৮ সালে লেনিনগ্রাদ আর মস্কো থেকে কেনা এই তিনখানা ছবির বই নষ্ট হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না। চিঠি আর ছবির বইগুলো একটা portfolio ব্যাগে ভরে পাঠাচ্ছি।

ছবির তিনখানা বই হল, যথাক্রমে : (১) উনিশ শতকের প্রথমার্ধের একজন রুশ neo-classical artist (রুশ দেশে খুবই বিখ্যাত) Alexander Ivanov-এর কয়েকখানা ছবির (যার মধ্যে তাঁর বিখ্যাত Masterpiece ছবি 'The Appearance of Christ to the People'-ও আছে); (২) এই শতকের গোড়ার দিককার বিখ্যাত ফরাসি (জন্মসূত্রে Flemish) Expressionist শিল্পী Maurice de Vlaminck, এবং (৩) মেক্সিকোর সবচেয়ে বিখ্যাত neo-realist এবং জাতীয় শিল্পী Diego Rivera-র দশখানা ছবি আছে। সেই সঙ্গে এখানকার 'একুশে সংসদের' প্রকাশিত 'প্রতর্ক'-র একখানা বিশেষ শিল্প-সংখ্যাও পাঠালুম। এই পত্রিকায় সত্যজিৎ চৌধুরি, পরিতোষ সেন, শুভাপ্রসন্ন, ইত্যাদির লেখা আছে। বিশেষ করে সত্যজিৎ চৌধুরির লেখাটা পড়বার মতো।

মাগো, আমি বিশেষ করে তোমাকে Vlaminck-এর ছবিগুলো এবং তাঁর সম্পর্কে ওই বইয়ের মুখবন্ধটা দেখতে বলি। Vlaminck ছবি এবং তাঁর বিষয়ে আলোচনা আমি এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না; দেখে থাকলেও মনোযোগ দিয়ে দেখেছি বলে মনে হয় না। Ivanov-এর ছবির পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত পরিপাট্য দেখার পর Vlaminck-এর 'Barges on the Seine' ও 'View of the Seine' (দুটোই ১৯০৫-১৯০৬ সালে আঁকা) দেখে আমি চমকে গেছি। 'Barges on the Seine' ছবিতে নদীকে একেবারে জিয়ন্ত হয়ে উঠতে দেখে বুকের মধ্যে কেমন ধক্ করে উঠল। সত্যি, Vlaminck-এর রঙ্-প্রয়োগের কায়দাকানুন আমার তো অনবদ্য ঠেকেছে। অবশ্য তাঁর ছবিতে ভান গখ, সেজান, ইত্যাদি পূর্বতন শিল্পীর প্রভাব লক্ষ করা যায় ঠিকই, তবু সবকিছু ছাপিয়ে উঠে তাঁর নিজস্বতাও স্পষ্ট। অল্প কয়েকখানা ছবির মধ্যেও শিল্পীর রঙ্ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শিল্পী হিসেবে তাঁর অগ্রগতি ও বিকাশ চোখে না-পড়ে পারে না; বিশেষ করে শেষের দিকে তাঁর নিজের ধরনে abstraction-এর দিকে যাওয়াটা উল্লেখ্য। এই সবকিছুই আমাকে মুগ্ধ করেছে। আবার এর পাশাপাশি Diego Rivera-র আধুনিক neo-realism-এর কাজও দেখার মতো।

আমি আর কী বলব মা। তুমি নিজে ছবি দেখে বিচার কোরো। এবং সময়মতো তোমার মতামত জানিও। Vlaminck-এর একটা অপূর্ণতা চোখে পড়ল, সেটা হচ্ছে ওঁর landscape painting-এ বিশেষ human figure দেখছি না এবং আলাদা করে কোনো portrait-ও নেই। জানি না, এত অল্প ছবি দেখে এ-কথা জোর করে বলা চলে কিনা। তবে Ivanov আর Rivera মানুষের মুখের portrayal-এ দেখছি সিদ্ধহস্ত। Ivanov-এর বড় ছবিটার মধ্যে একজন slave আর St. John the Baptist দুটো Head Study-কে magnify করে যে-ছবি দুটো ছাপা হয়েছে তা থেকে চোখ ফেরানো যায় না। আর মেক্সিকোর Rivera-র ছবিতে American Indian বা Maya-সভ্যতার মানুষের মুখে যে যুগযুগান্তের শোষণ আর বঞ্চনার চিত্ররূপ ফুটেছে তারও তুলনা নেই। Rivera অবশ্য শোষিত পশ্চাৎপদ দেশের প্রতিবাদী শিল্পী, ইতিহাসবোধে সমৃদ্ধ এঁর ছবি ও mural paintings আমার বিশেষ প্রিয়। এখানে খুব বেশি ছবি এঁর নেই তবু যা আছে তা-ই তোমাকে পাঠালুম।

এত কথার মধ্যে দিয়ে আমার মোট বক্তব্য এই: মা, তুমি মানুষের figure আর মুখের expression আঁকা ছেড়ো না। ছবি হিসেবে এ-সবেরও যথেষ্ট মূল্য আছে তবে এর সঙ্গে সঙ্গে অল্প-অল্প করে Expressionist ধাঁচে কিছু-কিছু landscape আঁকার চেষ্টাও চালিয়ে যেয়ো। তা না হলে তোমার রঙ্ ব্যবহারের বৈচিত্র্যের হাত তেমন খুলবে না। এইরকম নানা ধরনের ছবি এঁকে রঙের experiment এবং ছবি এঁকে কখনও মনে কোরো না, যা এঁকেছি যথেষ্ট হয়েছে; ছবির ব্যাপারে অতৃপ্তি আর অস্থিরতা শিল্পী হিসেবে তোমার development-এর বিশেষ সহায়ক। Vlaminck-এর ছবি দেখে এটা বুঝতে পারবে।

মা, তুমি এখনকার commission করা ছবি আঁকা বন্ধ কোরো না। এমনকি এ-ধরনের ছবিতে ক্রমে কতটা কী পরিবর্তন আনবে তা-ও ভেবেচিন্তে কোরো। Rembrandt-এর জীবনের সে-ই গল্পটা জানো তো? প্রথম জীবনে commission-করা ছবি এঁকে তাঁর পয়সা এবং নামডাক প্রচুর হচ্ছিল, তারপর হঠাৎ একদিন ওইরকম একটা ছবিতে chiaroscuro-র খেলা দেখাতে

গিয়ে ছবির মাঝখানে যেখানে আলোকসম্পাত ঘটালেন সেখানে যারা কমিশন করেছিল সেই Guild-এর অপ্রধান কয়েক ব্যক্তির ওপর আলো গিয়ে পড়ল আর Guild-এর কর্তাব্যক্তিরা সকলে আশেপাশে আবছা ছায়ায় থেকে গেল। ফলে সে-ছবি Guild প্রত্যাখ্যান করল আর বাজারে বদনাম হয়ে যাওয়ায় Rembrandt-এর শিল্পী হিসেবে পশারও গেল নষ্ট হয়ে। Commission-করা ছবিতে তাই experiment আর innovation-এর scope খুব-যে একটা আছে তা নয়। 'The Night Watch' নামের সে-ই বিখ্যাত Rembrandt-এর ছবি রোজগেরে শিল্পী হিসেবে যেমন তাঁর সর্বনাশ ডেকে আনল, তেমনই তার ফলে পরবর্তীকালে Rembrandt হয়ে উঠলেন বিশ্বখ্যাত ও সর্বকালের সেরা শিল্পী। কাজেই শিল্পী হিসেবে যখন তুমি রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত এবং পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হয়ে উঠবে তখনই তুমি Commission-করা ছবিতে বড়রকমের experiments ও innovation-এর কথা ভাবতে পারো।

Abstract ছবি আঁকতে তোমার যখন এত ভালো লাগছে এবং নিজেকে তুমি এত স্বাধীন মনে করছ, তখন ওইরকম ছবি অবশ্যই এঁকে চলবে। তবে আমার মনে হয়, তুমি Expressionist ধরনে landscape আঁকাটাও অভ্যেস করো। তাতে রঙ্ ব্যবহারের স্বাধীনতাটাও আয়ত্ত হবে, তোমার ছবির বিষয়বস্তুর horizon-ও আরও ব্যাপ্ত হবে এবং তা তোমাকে Portrait আঁকা ও Commission-করা ছবিতে experiment করার সুযোগ অপেক্ষাকৃত বাড়িয়ে দেবে। তবে Abstract বলো কিংবা Expressionist ধাঁচে landscape আঁকাই বলো, এ-সব ছবি আর তুমি এখন যে-সমস্ত ছবি আঁকছ তা একসঙ্গে এক Exhibition-এ দেখানো সম্ভব হবে কিনা তা বলা শক্ত। এ-ব্যাপারে তুমি সমালোচকদের মনোভাব সম্বন্ধে যা ভয় করছ তা বোধহয় খুব মিথ্যে নয়।

তবে এখনই তোমার Abstract ছবি আঁকার ব্যাপারে পুরোপুরি মন দেয়া নিয়ে আমার কিছুটা দোমনা ভাব আছে। আমার মনে হয়, ছবি আঁকায় একেবারে তর্কাতীত দখল না-আসা পর্যন্ত, একেবারে পুরোপুরি Master artist না-হওয়া পর্যন্ত এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ মন দেয়া বোধহয় ঠিক নয়। তার আগে Expressionist ধরনে ছবি এঁকে হাত পাকানো এবং তা থেকে ক্রমে ক্রমে abstraction-এর দিকে যাওয়াটা সম্ভবত বেশি বাস্তবসম্মত। যেমন ভান গখ, সেজান, Vlaminck, ইত্যাদি গেছেন। তবে এ-সমস্তই আমার ব্যক্তিগত মত জানবে। আমি নিজে তো চিত্রকর নই, তা হলে তোমাকে হয়তো আরও ভালোভাবে পথ দেখাতে পারতুম, অন্তত তার চেষ্টা করতুম। তাছাড়া ছবির প্রেরণা একেকজনের কাছে একেকভাবে আসে, কোনো শিল্পীও অপর এক শিল্পীকে এ-ব্যাপারে পুরোপুরি guide করতে পারে না। অতএব, শিল্পী হিসেবে তোমার পথের হদিশ একমাত্র তোমার মন, তোমার হাতের গুণাগুণ আর তোমার নিজস্ব কল্পনাই তোমাকে দিতে পারবে; আর কেউ নয়।

(একটা কথা আগে লিখতে ভুলে গেছি, এখন প্রসঙ্গত বলি, Vlaminck-এর মতো Picaso-র ছবি একদম ভালো লাগে না। কোনোদিনই লাগেনি। এমনকি প্যারিস-এ গিয়েও Louvre, ছোট Louvre, আধুনিকতম modern art gallery ইত্যাদিতে Picaso-র original ছবি দেখেও একেবারে মন ভরেনি। তার তুলনায় Vlaminck-এর ছবির praint আমাকে অনেক বেশি টেনেছে।)

মাগো, ছবির কথা লিখতে লিখতে এত জায়গা লেগে গেল এবং এত সময় লাগল যে ৯ তারিখ পেরিয়ে ১০ তারিখ এসে গেল। তাই আজ এখানেই শেষ করছি।

তোমার শরীর কেমন আছে, মাগো। শরীরের দিকে এবং চোখের দিকে একটু নজর দিও। চোখে বেশি strain কোরো না। আবার তোমার নাকেও Polypew-এর operation করতে হবে, লিখেছ। Operation-এর পর শরীর কেমন থাকে জানিও।

তোমার ২৬/১০-এর চিঠির অন্যান্য বিষয় নিয়ে পরে চিঠি দিচ্ছি।

ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, চোখকে মাঝে-মাঝে বিশ্রাম দিয়ে কাজ কোরো। আশা করি প্রতীকও ভালো আছে, বম্বেতেই আছে। মিকি-ও সুস্থ তো?

তোমরা আমাদের প্রাণভরা আদর ও শুভেচ্ছা জেনো।

—বাবা

পুনশ্চ: আমরা ভালোই আছি।

—বাবা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-এর এই চিঠি বোধহয় কোনো ব্যাখ্যার বা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কত নির্লিপ্তভাবে তিন দেশের তিন কবির শিল্পসৃষ্টি, তাঁদের ধ্যান-ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ তো চিঠি নয়, শিল্পীদের ছবি আমার চোখের সামনে তুলে ধরা। আমাকে অনুপ্রাণিত করা। এ চিঠির যথাযথ তাৎপর্য নিয়ে চর্চা করা বা কবির ওই শিল্পীদের বিষয়ে ধারণার অর্থ করা সম্ভব নয়। আমার অপরিণত মন থেকে এ চিঠির উত্তরে কী লিখেছিলাম মনে নেই। নিশ্চয়ই আমার কাঁচা মন্তব্যগুলোকেও seriously নিয়েছিলেন। কত সুন্দরভাবে আমাকে কত গভীর সব তত্ত্ব (শিল্প সম্পর্কিত) বুঝিয়েছেন।

নিউ আলিপুর
১৫ অক্টোবর, ১৯৯৬

মাগো,

তোমার ৩ তারিখের লেখা বড় চিঠিখানা পেলুম। তোমার charcoal-এ আঁকা ছবির প্রদর্শনী[১] বেশ সফল হয়েছে জেনে ভারি আনন্দ হল। মানুষ স্বভাবত সামাজিক প্রাণী, সাধারণত একা-একা থাকতে চায় না, কিন্তু অল্প কিছু লোক যারা অন্তত কিছুক্ষণ একা থাকতে পারে বা থাকতে চায়, তারাই কিছু মানসিক ফসল পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারে। যে-কোনো সৃষ্টিকর্ম নিছক একার সৃষ্টি, তাই একা হতে না পারলে সেটা সম্ভব হয় না। কলকাতায় থাকতে তুমি মা বিষম মিশুক আর আড্ডাবাজ ছিলে, তাই কলকাতা ছাড়ায় তুমি খানিক একা হয়ে গেছ আর তাই তোমার সৃষ্টির কাজে নতুন রসদ যুগিয়েছে। অপরপক্ষে আমি কিন্তু বরাবরই তেমন মিশুক নই, নিজের মধ্যে গুটিয়ে থেকেছি খানিকটা, তাই বোধহয় কলকাতার ভিড়ে থেকেও আমি ইচ্ছে করলে একা হয়ে যেতে পারি। তাছাড়া, কবিতা লেখার চেয়ে ছবি-আঁকায় শারীরিক পরিশ্রম আর দীর্ঘস্থায়ী মনঃসংযোগ বেশি দরকার হয়, সেজন্যে কবিতা-লিখিয়ের চেয়ে ছবি-আঁকিয়েকে নিছক বাজে আড্ডা আরও বেশি করে এড়িয়ে চলতে হয়।

তোমার পাঠানো ছোট্ট album-এর print-গুলোয় original-এর স্বাদ তেমন না-পেলেও গন্ধটুকু কিন্তু পেয়েছি। অর্থাৎ রেখায় আর ছবির আদ্‌রায় তোমার মুন্সিয়ানার স্বাদগন্ধ আর-কি। তোমার পাঠানো brochure-গুলোরও ছাপা ইত্যাদি ভালো হয়েছে, পত্রপত্রিকার আলোচনা ইত্যাদিও ভালো। মা, তুমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্পী হিসেবে পরিণত হয়ে উঠছ দ্রুত, এত দ্রুত আমিও নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। তোমার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে মা, ছবি আঁকার ব্যাপারে তুমি যথেষ্ট বিনীত, আত্মসন্তুষ্টিকে তুমি মোটেই প্রশ্রয় দাওনি। শিল্পী হিসেবে তোমার বেড়ে ওঠার এটাই কিন্তু একটা প্রধান শর্ত, জানবে। যে-শিল্পী, তা সে কবি, চিত্রকর, চলচ্চিত্র-নির্মাতা যাই হোক, সে যখন পরমত-অসহিষ্ণু ও আত্মসমালোচনায় বিমুখ হয়ে ওঠে তখন জানবে শিল্পী হিসেবে তার আর ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। ১

মা, তুমি ঠিকই বলেছ, তেলরঙের ছবির যেমন অনন্ত সম্ভাবনা তেমনই সেই ছবিতে রঙের প্রয়োগ নিয়েও অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গ্যাছে এবং এখনও হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি কি রঙের আরও নানা রকমফের ও মিশ্রণ নিয়ে কিছু ভেবেছ? আমাদের দিশি শিল্পীরা, যেমন যামিনী রায়, গণেশ পাইন, ইত্যাদির আঁকার Medium নিয়ে ভেবেছ কিছু? যামিনী রায় তো আমাদের লোকশিল্পের অনুসরণে গাছগাছড়া ইত্যাদি থেকে নিজে রঙ্ বানিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতেন। রঙ বানানো ও রঙ্ ব্যবহারের এই কায়দাটা আমাকে কিন্তু বেশ fascinate করে। তোমাকে করে না, মা? আমি এইসঙ্গে খবরের কাগজের একটা cutting পাঠালুম : উড়িষ্যার একজন পটুয়া চিত্রীর রঙ্ তৈরির ও রঙ্ ব্যবহারের কায়দাকানুন নিয়ে একটা report। একটু পড়ে দেখো তো মা, এটা তোমার কোনো কাজে লাগে কিনা। অবশ্য দিশি রঙ্ বানানো ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তেলরঙ্ আর জলরঙের ছবি ও এঁকে যাওয়া দরকার বোধহয়, অন্তত তোমার development-এর এই stage-এর সময়টায়।[২]

একটা কথা বলতে ভুলেছি। মা গো, তোমার এবারকার charcoal drawing-গুলোয় মুখের নানা expression ভারি সুন্দর ফুটেছে। দারিদ্রের পীড়ন, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দৃঢ়তা, বয়স্কের অভিজ্ঞতার ও পোড়খাওয়া-মুখে গভীর আত্মমগ্নতার ছাপ, একটি মেয়ের মুখ ও মুখোশের বৈসাদৃশ্য এবং এক বৃদ্ধের মুখে একই সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও লড়াইয়ের চিহ্ন এবং চোখে স্বপ্নালু চাউনি, ইত্যাদি। এই শেষের ছবিটি আমার ভারি পছন্দ হয়েছে : মাথায় অল্প-অল্প চুল আর ঘাড়ের কাছে চুলের বোঝা, মুখ একই সঙ্গে দৃঢ়তা অথচ ভারি একটা প্রসন্নতা এবং চোখে স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। মুখে মনের এমন আশ্চর্য প্রতিফলন খুব কম মানুষের মুখে দ্যাখা যায়। মানুষের মুখকে মনের দর্পণ করে তোলায় তুমি তো রীতিমত expert হয়ে উঠেছ। তোমার জয় হোক।

বিশ্ব-পরিক্রমার আনন্দে মশ্‌গুল হয়ে তোমরা দু'জন স্বদেশে ফিরে এসো মা। আচ্ছা, তোমাদের এবারের বিশ্ব-পরিক্রমার itinerary-তে জাপানের স্থান নেই কেন? ওই দেশটা এবং তার চিত্রকলা তো সত্যিই দ্যাখার মতো— তাই না?

—বাবা

---

১. ১৯৯৬ সালে মুম্বাইয়ের একটি প্রাইভেট গ্যালারিতে আমার চারকোল এবং পেন্সিল drawing-এর প্রদর্শনী হয়। এতে যে সব ছবি দিয়েছিলাম তার মধ্যে থেকে দু-একটি ছবি বাবার বেশ পছন্দ ছিল। নানা ধরনের প্রতিকৃতির কথা ভেবেছিলাম। মুম্বাইতে আগের প্রজন্মের শিল্পীরা, যেমন হুসেন, রাজা, সুজা ইত্যাদিরা প্রতিকৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যথেষ্টই করেছেন কিন্তু আমার সমসাময়িক শিল্পীরা প্রায় কেউই সেরকমভাবে ভাবেননি। কাজেই আমার এই শুধু মুখাবয়ব নিয়ে ভাবনাচিন্তা প্রশংসা কুড়িয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে আমার বাবা বড্ড খুশি হয়েছিলেন এই সাফল্যে। কিন্তু আমি শিল্পী হিসেবে জানতাম যে শুধু portraiture নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। অন্যরকম ছবি ভাবতে হবে। তাই এত প্রশংসা সত্ত্বেও আমি আত্মতুষ্টির শিকার হয়ে পড়িনি। এটার কথাই বাবা বলেছেন।

২. এখানে কবি মঙ্গলাচরণ রঙের নানা রকমফের ও মিশ্রণের কথা ভেবেছেন। আমরা জানি যে শিল্পী যামিনী রায় ওঁর পশ্চিমী প্রশিক্ষণ বা training-কে সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনায় বাতিল করেছিলেন। আমাদের নিজস্ব পটচিত্র দেখে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে নিজের style পুরোপুরি ভারতীয় করে ফেলেন। উনি canvas-এ ছবি আঁকা ছেড়ে দেশজ কাগজ, কাপড়, চাটাই ইত্যাদির ওপর ছবি আঁকতেন একেবারে flat-ভাবে রঙ বসিয়ে। রঙ্ নিজে বানাতেন ঘড়িমাটির সঙ্গে শিরীষ আঠার মিশ্রণে। Indian Red, Yellow ochre, Cadmium green, Vermillion ইত্যাদি নানা রঙের সংমিশ্রণে তৈরি করতেন। শিল্পী গণেশ পাইনের অন্যদিকে অনচ্ছ জলরঙের মিশ্রণে নানা ধরনের ছবি, যাতে আছে রূপক, অলংকার এবং প্রতীক। বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি যেখানে নানা miniature ছবি, সিনেমা-অনুপ্রাণিত ছবি এবং ওঁর মনের গভীর থেকে উঠে আসা অনবদ্য সব ছবি এঁকেছেন। শিল্পী গণেশ পাইন-এর ছবিতে ভীষণভাবে আকৃষ্ট ছিলেন বাবা।

নিউ আলিপুর
১৫ মার্চ, ১৯৯৭

খুকু-মা,

এতদিনে প্রাণ-ভরে ছবি আঁকতে পারছ জেনে আমি নিদারুণ খুশি। যদিও এই সব নতুন ছবির অধিকাংশ commissioned ছবি, তবু ছবি আঁকার অভ্যেসটা এর মধ্যে দিয়ে চালু থাকলে ফাঁকে-ফাঁকে নিজস্ব ছবি আঁকারও সুযোগ পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। তাছাড়া এবার Bombay গিয়ে তোমার কয়েকখানা নতুন ছবি দেখে আমি দারুণ আশান্বিত। মনে হচ্ছে, তোমার আঁকায় যেন একটা breakthrough-র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আঁকার অভ্যেসটা বজায় রাখলে এই breakthrough স্থায়ী নতুন ধরনের ছবি আঁকার রূপ নেবে মনে হয়। যে-কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পীর পক্ষে শিল্পচর্চায় সিদ্ধিলাভ (আমি বাজারি সাফল্যের কথা বলছি না) জীবনে সবচেয়ে বড় কথা।[১] নিয়মিত লেখার অভ্যেস রাখতে না-পারা আমার জীবনে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলে আমি মনে করি;[২] সংসারের নানা আজেবাজে দায়িত্বে আর কাজে জড়িয়ে পড়ে আমি জীবনে অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছি; সে-সব দায়িত্ব পালন করে মাঝে থেকে খালি বদনামই কুড়িয়েছি, কারো বিশেষ কোনো উপকার করতে পারিনি, বরং নিজের অসম্ভব ক্ষতি করেছি। তার ফল ভুগছি এখন।[৩] ইন্দু মেসোমশাই স্রেফ আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করেছেন, আঁকার অভ্যেস রাখেননি। তুমিও কলকাতায় অনেক সময় নষ্ট করেছ, কী করবে মনস্থির করতে না-পেরে। তখন বোঝোনি মা, একজন সৃষ্টিশীল (creative) শিল্পীর পক্ষে শিল্পচর্চা ও সেই চর্চার মধ্যে দিয়ে শিল্পসিদ্ধি লাভ করাটাই জীবনের সর্বপ্রধান কাজ। আর সবই গৌণ। এটা আমি যখন বুঝেছি, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তুমিও যেন মা এই ভুল কোরো না।

প্রদ্যোত[৪] হঠাৎ মারা গেল। অবশ্য গত কয়েক বছর আমার সঙ্গে ততটা যোগাযোগ ছিল না। শেষজীবনে ও ভীষণ bitter হয়ে গিয়েছিল।

৫ জানুয়ারি তোমার কলকাতা আসার প্রতীক্ষায় থাকব। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো মা। তুমি ও প্রতীক আমাদের আদর ও শুভেচ্ছা জেনো।

—বাবা

---

১. সাংসারিক মনকে সরিয়ে রেখে সৃষ্টিশীলতায় মননিবেশ করা যে কত কঠিন কাজ মানুষের পক্ষে সেটা কবি মঙ্গলাচরণ বুঝতেন। আরও জানতেন যে ওঁর মেয়ে মিশুক প্রকৃতির— মানুষের থেকে নিজেকে সরাতে সে অপারগ। তাই বড়োই চিন্তা ছিল যে আমি কী করে কাজ করব? সত্যিই তো তাই হল শেষপর্যন্ত। কিছুতেই মানুষের থেকে নিজেকে সরাতে পারলাম না। পারলাম না নিজের মধ্যে ডুবে যেতে।

২. আমার ঠাকুরদা সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান আমার বাবা। ঠাকুরদা হঠাৎ ১৯৫৫ সালে প্রয়াত হওয়ায় তখনকার যৌথ পরিবারের দায়িত্ব বর্তায় বড়ো ছেলের ওপর। সবরকম সৃজনশীলতাকে পাশে সরিয়ে রেখে তাঁকে তখন অন্তহীন আর্থিক এবং আইনী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়। যৌথ পরিবারের (বাবার নিজের পাঁচ ছোটো ভাই ছাড়া ছিলেন বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোন চারটি।) সম্পত্তিজনিত জটিলতার সমাধান পারিবারিক উকিলের সাহায্যে করতে হয়। যে কাজটি উনি উপভোগ করেননি বিন্দুমাত্র। কিন্তু সুসম্পন্ন করা সত্ত্বেও পরিবারের সকলের মন রাখতে না পারার দুঃখ ছিল অনেক।

৩. ইন্দুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় বাবার ছোটো শালীর স্বামী। বাবার একান্ত প্রীতিভাজন একজন মানুষ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কিন্তু সেই প্রতিভার বিকাশ সেইভাবে করতে পারেননি। কিন্তু এত বিষয়ে জ্ঞান ছিল যে বাবা তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে খুব ভালোবাসতেন। ইনি মূলত চিত্রশিল্পী— লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন— Span magazine-এর Art Director ছিলেন কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এতরকম কাজ করেছেন যে ভাবা যায় না। আমাদের পুরো পরিবারে এঁর মতো প্রতিভাশালী মানুষ আর দ্বিতীয় নেই।

৪. প্রদ্যোত গুহ। কবি ও লেখক। বাবার সঙ্গে শেষ বছর কুড়ি বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। এই প্রদ্যোত গুহ বাবার Soviet Information-এ যোগ দেবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন এবং সেটা ঘটিয়েছিলেন।

নিউ আলিপুর
১২ মে, ১৯৯৭

মাগো,

তোমার ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে তোমার জীবনের সব অপূর্ণতার পূর্তি যেন ফিরে পাও কায়মনোবাক্যে এই আমাদের কামনা।[১] যারা জীবনে অনেক-কিছু পেয়েছে

তাদের পক্ষে শিল্পকে গভীর অর্থপূর্ণ করে তোলা খুবই কঠিন হয়। তারা technique-এর ভেল্‌কি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দ্যায়, নতুন ভঙ্গির মধ্যেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা খোঁজে, আর নয়তো হয়ে পড়ে গতানুগতিক। তোমার এবারকার ছবির মধ্যে figurative ভঙ্গির অদলবদল, পরিবর্তন কিংবা ভাঙচুর কতটা কী ঘটবে তা-ই দ্যাখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। একই সঙ্গে পরিবর্তন আর গভীরতা কতটা আনতে পারবে ছবিতে তা দ্যাখার জন্যে আমার মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ গড়ে উঠেছে। তোমার নতুন ছবির কয়েকটা print দ্যাখার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব, জানবে।

আমার জীবন তো শেষ হয়ে এল। এখন তোমার শিল্পানুসন্ধান ও সৃষ্টির মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয়ে, আমি সৃষ্টিসুখ উপভোগ করে যেতে চাই। তাই এই অধীর প্রতীক্ষা।

আমি আবার কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করছি। কতদূর পেরে উঠব, জানি না। আমাদের জীবন কাটছে যথাপূর্বং। আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ খুবই কম। দু-একজন ছাড়া। আত্মীয়স্বজন দু-একজন যোগাযোগ রাখে। তার মধ্যে তোমার ফুলকাকা[২] একজন। তোমার মেজকাকাও একদিন এসেছিল।

তোমরা ভালো থেকে, মা। সাবধানে থেক।

—বাবা

১. আমার ছবির ভেতর বেঁচে থাকতে চাইতেন বাবা। কত আশা করেছিলেন। আমার ভেতর কত সম্ভাবনা দেখেছিলেন। যাঁরা আমার ছবির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন যে সম্ভাবনা আমার যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। বম্বে যাওয়ার পরেই Taj Hotel-এ যখন প্রদর্শনী করি, তখন অনেক সমালোচক খুব ভালো ভালো কথাও লিখেছিলেন। তার বিশেষ কারণ আমার তো Academic পাণ্ডিত্য বা শিক্ষণ ছিল না। একেবারেই সহজাত, প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ছিল। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও সেরকম একটা কিছু হল না। 'কেন হল না'-র উত্তর আমার কাছেই আছে। প্রথমত, কোনো কিছু পাবার বা করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না। Ambition কি জিনিস আমার জানা ছিল না। এছাড়া সৃজনশীল মন হয়তো ছিল কিন্তু সৃষ্টিপ্রবণতা ছিল না। ছবি না আঁকলে জীবনযাপন দুঃসাধ্য বলেও মনে হয়নি। কারণ আসল ভালোবাসা ছিল মানুষের প্রতি। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলাপ, কথাবার্তা, উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি দুর্বলতা ইত্যাদি বিষয়গুলোই আমার প্রথম প্রেম ছিল। বাবা সেটা ভালোই জানতেন। প্রায়ই আমাকে আত্মস্থ হবার পরামর্শ দিতেন। আজ আমি আত্মস্থ। সৃষ্টিকর্মের ইচ্ছে আমায় পাগল করে। আমি ছবি আঁকি। কিন্তু ওই মানুষটাকে কিছু দিতে পারিনি।

২. আমার ফুলকাকা, বাবার নিজের সর্বকনিষ্ঠ ভাই। তাঁর নাম ড. চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায়। বাবা-মার নিউ আলিপুর-বনবাসে ওই কাকা প্রায়ই আসতেন তাঁর বড়ো ভাই ও বৌদির কাছে।

নিউ আলিপুর
১৩ অক্টোবর, ১৯৯৭

মাগো,

তোমার সবচেয়ে মূল্যবান চিঠিখানি হঠাৎ হারিয়ে যাওয়াতে মহা মুশকিলে পড়েছি। — যে চিঠিতে তুমি তোমার এখনকার কয়েকখানা আঁকা ছবির বর্ণনা দিয়েছিলে। যাইহোক, যতদূর মনে পড়ছে তুমি চিত্রানুপাত বা ছবির ভেতর figure ইত্যাদির পারস্পরিক অনুপাত বা perspective এবং আলো-অন্ধকারের সম্পাত বা chiaroscuro-র হেরফের ঘটিয়ে বক্তব্য বিষয়ে একটি নাটকীয়তা আনতে চেয়েছ। তোমার ঐ বর্ণনা পড়ে ছবিগুলোর ফোটোগ্রাফিক প্রিন্ট দ্যাখার জন্যে উৎসুক হয়ে আছি। তোমার আঁকা figure-গুলোতে নতুন কোনো পরিবর্তন আনতে চাইছ কিনা তা-ও দেখতে চাই। তোমার ছবি আঁকা আর কতদূর এগুলো মা? খুব তাড়াহুড়ো যখন নেই, তখন একটু আস্তেধীরে ছবি এঁকো। ছবি আঁকার সময় নিজের চোখের স্বাস্থ্য-বিষয়েও নজর রেখো মা। ভালো থেকো মা।

—বাবা

১. সবচেয়ে মূল্যবান চিঠি আমার বাবার কাছে সেইটাই যাতে ছবির আলোচনা ভরপুর। এতটাই ছবি ভালোবাসতেন। অন্যান্য চিঠিতেও অনেক painting-এর বিষয়ে লেখা আমায় অবাক করে। অনেক সময়ে ভেবেছি ছবির বিষয়ে এত জ্ঞান কী করে জন্মায় কবির? অবসর সময়ে আমার বাবা ভ্যান গখ, সেজান বা গগ্যার বই-এর পাতা ওলটাতেন। ওখান থেকেই আসতো লেখার অনুপ্রেরণা। Impressionist artist-দের রঙের খেলা, রং চাপানো এবং আঙ্গিকের সরলীকরণ মুগ্ধ করেছে কবিকে। ভ্যান গখ-এর 'Starry Night'-এর ওপর একটি কবিতাও লিখেছেন।

নিউ আলিপুর
২৯ এপ্রিল, ১৯৯৮

মা-মনি,

তোমার ৭, ৮ ও ১৭ তারিখের চিঠি আমরা ২৫ তারিখ মঙ্গলবার পেয়েছি। তোমার চিঠির অনেকখানিতেই বিদেশের জলহাওয়ার গন্ধ মাখানো। আমি শুনেছিলুম, দক্ষিণ ফ্রান্স অতি মনোরম জায়গা। ফ্রান্সের অনেক শিল্পী পাকাপাকি দক্ষিণ ফ্রান্সে থাকতেন, যেমন সেজান, শাগাল ইত্যাদি। এমনকি ভ্যান গখ্‌ও কিছুদিন ওদিকে ছিলেন। তবে ভাগ্যি ভালো যে তাঁরা কান্ বা নিস্-এ থাকতেন না, একালের commerce-এর ফাঁদে তাঁরা জড়িয়ে পড়েননি সেজান-এর কিছু ছবিতে তুমি যেমন লিখেছ তেমনই গাঢ় নীল সমুদ্র আর ধারে পাহাড়ের সারির ছবি আছে। তবে সে-সব ছবি অমন

কোনো প্রসিদ্ধ জায়গার ছবি নয়। ওই সব শিল্পীর জীবনকথা পড়ে আমার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল দক্ষিণ ফ্রান্স বুঝি অনেকটা নাতিশীতোষ্ণ এলাকা। তোমার চিঠি পড়ে দেখছি ব্যাপারটা সত্যিই তো অমন নয়[১]। তাহলে বেচারা মস্কো কী দোষ করল। ওখানেও অক্টোবর-মার্চ প্রচণ্ড শীতের সময়। তবে সে-শীত সেপ্টেম্বর আর এপ্রিলের বেশ খানিকটাতেও হাত বাড়িয়ে দ্যায়, এই যা তফাত্।

তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমার মস্কোর কথা ভেবে মন কেমন করছিল। অবশ্য এখনকার মস্কো নয়, সে-ই সেদিনের মস্কো। যেমন মিষ্টি মনোরম আবহাওয়া সেখানকার, তেমনই সেদিন ছিল মানুষের সহৃদয় মিষ্টি ব্যবহার। ওখানে গিয়ে জীবনে প্রথম আমি মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের, মুক্তি আস্বাদ পেয়েছিলুম, আশেপাশে কিছু কিছু মনের-মতো-মানুষও পেয়েছিলুম। আর তারপরেই এক ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়লুম কলকাতার আবহাওয়ায় বা একগলা পাঁকপচা নোংরা জলে, যেখানে আত্মীয়স্বজন বলতে ঈর্ষা, অসূয়া, কুৎসিত কলহ আর দুর্গন্ধের বিষবাতাস-ছড়ানো। যদি-না কলকাতায় ফিরে তোমাকে নতুন করে পেতুম এবং তোমার দুই ভাইকে— তাহলে এখানে বেঁচে থাকাই কষ্টকর হোত। এখন আবার নাতনিটি একটু বড় হয়ে মায়ায় বেঁধেছে। ওর 'ঠাম্মি'-কে ও এত ভালোবাসে যে, তুমি তো আমার মা!

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। সৃষ্টিশীল মন অন্যান্য ভোঁতা, গতানুগতিক মনের কাছে বড়ই বিরক্তিকর, এমনকি আপত্তিকরও। তাই অনেকের মধ্যে থেকেও এরা বড্ড একা হয়ে পড়ে। কামনা করি, তোমার সৃষ্টিশীল একাকিত্ব নিয়েও তুমি যেন মাথা উঁচু করে থাকতে পার।

তুমি কিন্তু মা তোমার চিঠিতে তোমার ছবি নিয়ে একটি-কথাও বলনি। কেবল একটি পেন্সিল-স্কেচ পাঠিয়েছ মাত্র। অবশ্য তোমার হেলাফেলায় আঁকা স্কেচ দেখেও দক্ষিণ-ফ্রান্সের শহরাঞ্চলের সমুদ্রের তীর আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু তোমার ছবি সম্পর্কে, এমনকি সাধারণভাবে ছবি সম্পর্কেও, কোথাও কোনো উচ্চবাচ্য করনি। কেন? কী ভাবছ তুমি ছবি সম্পর্কে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে। নতুন কোনো পথের হদিশ কি দেখতে পাচ্ছ? এমন কোনো পথের হদিস, যা থেকে আমিও লাভবান হতে পারি?

গতকাল সন্ধেবেলা হঠাৎ তুমি টেলিফোন করেছিলে। আমি তোমার মায়ের কথা ভুল বুঝেছিলুম, কিংবা ভুল শুনেছিলুম। বম্বের Taj Hotel-এ তোমার ছবির Exhibition হবে। এ তো ভালো খবর। তুমি অবশ্যই ভালো করে ছবি এঁকো এবং সবসময়েই একটু নতুন ভাবে ছবি-আঁকার চেষ্টা কোরো মা।

আমাদের জন্যে তুমি অনর্থক ভেবে শরীর-মন নষ্ট করবে না, মা। তার চেয়ে তোমার নিজের ছবির কথা আরও বেশি করে ভাবো, তাতে আখেরে লাভ হবে। তুমি সামনের অগস্টে এখানে আসার কথা ভাবছ কেন মা? যদি বিশেষ কোনো কারণ না থাকে, তাহলে বরং সামনের অক্টোবরে, পুজোর সময়, এসো। তখন অন্তত বৃষ্টি আর গুমোটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। তোমরা সকলে ভালো থেক মা।

—বাবা

---

১. দক্ষিণ ফ্রান্সের জলহাওয়া পাঠকের অবগত থাকবে যে সত্যিই নাতিশীতোষ্ণ। কিন্তু আমরা গিয়েছিলাম March-এর শেষে। হয়তো সেইভাবে গরমজামা নেওয়া হয়নি কাজেই প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছিল তার আরো একটা কারণ আমি চিরকাল কলকাতায়-থাকা শীতকাতুরে মেয়ে।

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-এর
চিঠির বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

পুনঃপাঠ

সিয়াহ্ হাশিয়ে

সআদাত হাসান মান্টো

সআদাত হাসান মান্টো-র 'সিয়াহ হাশিয়ে' (আক্ষরিক অনুবাদে যা দাঁড়ায় 'ছায়ায় ঢাকা'), ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত অণুগল্প, কৃশকায় গল্প আর ছোটগল্পের এক অনবদ্য সংকলন। এই সংকলনের মাধ্যমে মান্টো আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন দেশভাগ-জনিত দাঙ্গার এক আশ্চর্য দলিল। উপমহাদেশের এই অস্থির সময়ে মানুষ তার যুক্তি বুদ্ধি বিচার বোধ সবকিছু হারিয়ে কীরকম পাগলের মতো ব্যবহার করেছিল (মান্টোর ভাষায়, হঠাৎ কি একটা ছিঁড়ে গেল!) তার যেন এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাই এইসব লেখায়। উৎসর্গপত্রে মান্টো লিখেছিলেন, 'সেই মানুষটিকে, যে নিজের দোষ স্বীকার করে বলেছিল: 'যখন আমি একজন বুড়িকে মারলাম, তখন আমার মনে হল যেন আমিই মরে গেছি।' আরেক রকম-এর জন্য কয়েকটি লেখা অনূদিত হল মূল উর্দু পাঠ থেকে, যেগুলো পাওয়া গেছে দিল্লি-র রাজকমল প্রকাশনের মান্টো রচনাসংগ্রহ 'দস্তাবেজ' পেপারব্যাক সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে [পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৬]। —সোমেশ্বর ভৌমিক

জান্তব

স্বামী-স্ত্রী কোনোমতে সামান্য কিছু ঘর-গেরস্তালির জিনিস বাঁচাতে পারলেন। তাঁদের এক কিশোরী মেয়ে ছিল, ওর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। কোলের একটা মেয়ে ছিল, তাকে অবশ্য মা নিজের বুকের মধ্যে ঢেকে রেখেছিলেন। তাদের ছিল একটা বাদামী মোষ, সেটাকে দাঙ্গাবাজরা জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের একটা গাইও ছিল, সেটা বেঁচে গেল, তবে তার বাছুরটাকে পাওয়া গেল না।

স্বামী, স্ত্রী, কোলের মেয়েটি আর গাইটা, এক জায়গায় লুকিয়ে ছিল। রাতটা ছিল খুব অন্ধকার। বাচ্চাটা যখন ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করল, তখন মনে হচ্ছিল রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে যেন ঢোল বাজছে। মা ভয় পেয়ে হাত দিয়ে বাচ্চার মুখ ঢেকে দিলেন, যাতে দুশমনেরা শুনতে না পায়। আওয়াজ কমেই গেল। তবু আরো সাবধান হওয়ার জন্য বাবা বাচ্চার ওপর একটা মোটা চাদর চাপিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পরে হঠাৎ দূরে কোথাও একটা বাছুর ডেকে উঠল। গাইটার কান খাড়া হয়ে গেল—সে উঠে দাঁড়িয়ে, পাগলের মতো লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ডাকতে শুরু করল। তাকে চুপ করানোর অনেক চেষ্টা হল, কিন্তু সব বেকার।

শব্দ শুনে দুশমনেরা কাছে চলে এল। ওদের হাতে ধরা মশালের আভা দেখা গেল।

মহিলা ভীষণ রেগে স্বামীকে জিগেস করলেন, 'তুমি কেন আবার এই জন্তুটাকে সঙ্গে এনেছ?'

[মূল রচনা: হ্যায়ওয়ানিয়াৎ]

সহযোগিতা

হাতে লাঠি বাগিয়ে চল্লিশ বা পঞ্চাশ জনের এক জনতা একটা বিরাট বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে, লুটপাট করবে বলে।

হঠাৎ, মধ্যবয়স্ক একজন রোগা মানুষ জনতার ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজনীতিকদের মতোই হাত-পা নেড়ে কথা বলতে শুরু করল। 'ভাইসব, এই বাড়িতে কত যে সম্পদ আছে, তা কল্পনাও করতে পারবেন না, অধিকাংশই মহার্ঘ আর মূল্যবান...এর সবকিছুই আমরা দখল করি আর তারপরে নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিই।'

অনেক হাতের লাঠি হাওয়ায় উছলে উঠল, মুঠো-করা অনেক হাত উঠতে-নামতে লাগল আর ফোয়ারার মতো স্লোগান বেরিয়ে এল।

মধ্যবয়সী রোগা লোকটির নেতৃত্বে জনতা দ্রুতপায়ে এগোতে শুরু করল সেই বাড়ির দিকে, যেখানে জানা গেছে প্রচুর সম্পদ আর মূল্যবান জিনিসপত্র রয়েছে।

বাড়িটার সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রোগা লোকটি আবার হাত-পা নেড়ে বলল, 'ভাইসব, এই বাড়িতে যা কিছু আছে তা আপনাদেরই... ফলে, জিনিসপত্র নিয়ে কাড়াকাড়ির দরকার নেই, নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে নামারও দরকার নেই। আসুন!'

'দরজায় তো তালা', চিৎকার করে বলল কেউ।

একজন বলল চিৎকার করে, 'দরজা ভাঙা হোক।'

'ভেঙে দাও... গুঁড়িয়ে দাও।' অনেক হাতের লাঠি হাওয়ায় উছলে উঠল, মুঠো-করা অনেক হাত উঠতে-নামতে লাগল আর ফোয়ারার মতো স্লোগান বেরিয়ে এল।

রোগা মানুষটি হাত নেড়ে যারা দরজা ভাঙতে চাইছিল তাদের শান্ত থাকার জন্য ইশারা করল, তারপর আলতো হেসে বলল, 'ভাইসব, থামুন... চাবি দিয়ে দরজাটা খুলছি আমি।'

এই বলে মানুষটা পকেট থেকে একগুচ্ছ চাবি বার করে সাবধানে একটিকে বেছে নিল আর তালায় ঢুকিয়ে দিতেই তালা খুলে গেল! শিশুকাঠের ভারী দরজাটা যখন একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে ফাঁক হয়ে গেল, তখন তামাম জনতা ভেতরে ঢোকার উত্তেজনায় দল বেঁধে এগিয়ে গেল।

রোগা লোকটি কামিজের আস্তিন বুলিয়ে নিজের কপালের ঘাম মুছে বলল, 'ভাইসব, আরামসে... এখানকার সমস্ত কিছু আপনারাই পাবেন.... মিছিমিছি তাড়াহুড়ো করে কোনও লাভ আছে?'

নিমেষের মধ্যে জনতা শান্ত হয়ে গেল, আর যথাসম্ভব শৃঙ্খলার সঙ্গে তারা সেই প্রাসাদে ঢুকল। তবে, একবার ভেতরে লুঠতরাজ শুরু হওয়ার পর আবার তারা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল। বেআক্কেলের মতো তারা দামী দামী জিনিসপত্রে হাত মুছতে লাগল।

এসব যখন রোগা মানুষটির চোখে পড়ল, গলায় ব্যথার সুর এনে লুঠেরাদের সে বলল: 'ভাইয়েরা, আস্তে আস্তে... নিজেদের মধ্যে লড়াই করার কোনও দরকার নেই... ভাঙচুরেও কাজ নেই... আসুন আমরা মিলেমিশে কাজ করি। অন্য কারো হাতে মূল্যবান কোনো জিনিস দেখলেও তাকে ঈর্ষা করবেন না... বিশাল বাড়ি এটা, নিজের জন্য মূল্যবান আর একটা কিছু খুঁজে নেন... ঝগড়া করবেন না... এরকম করলে জিনিসগুলো ভেঙে যাবে... এতে আপনাদেরই ক্ষতি।'

আবার জনতার মাঝে শৃঙ্খলা ফিরে এল আর ধীরে ধীরে বাড়ির জিনিসপত্র খালি হতে থাকল।

থেকে থেকেই রোগা লোকটির পরামর্শ শোনা যাচ্ছিল।

'ভাইসাব, ওটা রেডিও... আলতো করে তোলো, যাতে ওটা ভেঙে না যায়... আর হ্যাঁ, অ্যান্টেনাটাকেও ফেলে যেও না।'

'সাবধানে ভাই, এটাকে সাবধানে... আখরোট কাঠের তেপায়া এটা, হাতির দাঁতের কাজ করা, খুব পলকা... হ্যাঁ, এবারে ঠিক আছে।'

'না, না, এখানে মাল খেও না... মাতাল হয়ে যাবে... বোতলটা নিয়ে যাও।'

'আরে থামো-থামো, আমাকে মেইন স্যুইচ অফ করতে দাও... নইলে প্রচণ্ড শক খাবে...'

এর মধ্যে এক কোণায় শোরগোল উঠল— চারজন লুটেরা রেশমের একটা থান নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু করল। রোগা মানুষটা দ্রুত সেখানে পৌঁছল আর মোলায়েম গলায় ওদের বলল: 'কীরকম অবুঝ তোমরা... এভাবে টানাটানি করলে থানটা তো ফুটিফাটা হয়ে যাবে... বাড়িতে সবই আছে, মাপার ফিতেও... খুঁজে দেখ, তারপরে কাপড়টাকে মেপে চারটে সমান ভাগে কেটে নাও।'

হঠাৎ একটা কুকুরের গলা শোনা গেল... ঘেউ ঘেউ ঘেউ...

এবং পরমুহূর্তেই বিদ্যুতের ঝলকানির মতো এক বিশাল কুকুর লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল, আর দু-তিনজন লুঠেরাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

রোগা লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, 'টাইগার... টাইগার...'

টাইগার, যে কিনা লুঠেরাদের মধ্যে একজনের গলার নলিটা তাক করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে রোগা লোকটির কাছে চলে গেল।

টাইগার আসামাত্রই আর সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। বাকি ছিল কেবল সেই মানুষটি টাইগার যার গলার নলি কামড়ে ধরেছিল।

রোগা মানুষটির দিকে তাকিয়ে সে জিগেস করল, 'কে আপনি?'

'আমি এই বাড়ির মালিক।' হেসে বলেন মানুষটি। 'আরে সাবধান, কাচের ফুলদানিটা হাত থেকে পড়ে যাবে যে!'

[মূল রচনা: তআবুন]

জুতো

দাঙ্গাবাজেরা তাদের রাস্তা বদলাল
আর স্যার গঙ্গারামের মূর্তির ওপর চড়াও হল।
তাদের হাতের লাঠি চলছে যথেচ্ছ,
ইঁট আর পাথর ছোঁড়া হচ্ছে;
একজন মূর্তির মুখে আলকাতরা মাখিয়ে দিল; আর একজন অনেক পুরনো জুতো জমা করে তাই দিয়ে মালা বানিয়ে যেই মূর্তির গলায় পরানোর জন্য এগোল,
অমনি পুলিশ এসে গুলি চালাতে শুরু করল।
মূর্তির গলায় জুতো পরাচ্ছিল যে, সে জখম হল
সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য ওকে
পাঠানো হল স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে।

[মূল রচনা: জুতা]

কেরামতি

লুটের মাল খুঁজে বার করতে পুলিশ ঘরে ঘরে তল্লাশি করছিল।

ভয়ের চোটে লোকেরা বেআইনি মালগুলো রাতের অন্ধকারে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলছিল। কেউ কেউ আবার এমনও ছিল যে মওকা বুঝে নিজের মালগুলোকেও খালাস করে দিচ্ছিল, যাতে গ্রেফতার না হতে হয়।

একজন পড়ল মহা সমস্যায়। ওর কাছে ছিল দুই বস্তা চিনি,

যেগুলো সে পাড়ার মুদিখানাটা লুট হওয়ার সময় নিজের ঘরে এনে তুলেছিল। একদিন গভীর রাতের অন্ধকারে মহল্লার কুয়োতলায় গিয়ে একটা বস্তাকে বেশ সহজেই ফেলে এল। কিন্তু অন্যটা ফেলতে গিয়ে সে নিজেও কুয়োয় পড়ে গেল।

তার চিৎকার শুনে সবাই জড়ো হল। কুয়োয় দড়ি নামানো হল। ছোকরাদের নামানো হল, ওরা ওকে ওপরে তুলে আনল। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরে লোকটা মরেই গেল।

পরের দিন সকালে মহল্লার লোক যখন কুয়ো থেকে খাবার জল তুলল, তারা দেখল জল মিষ্টি।

সেদিন রাতে কেরামতবাজের মাজারে সারারাত বাতি জ্বলেছিল। [মূল রচনা: করামাত]

মজুরি

এমনিতেই দাঙ্গাফাসাদ আর লুঠতরাজে বাজার গরম, তার ওপর চারদিকে আগুন জ্বলছে, আর গরমটাও বেড়ে গেছে।

এসবের মধ্যেই একটা লোক গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে খুশিমনে গাইতে গাইতে,

তুমি যখন চললে বিদেশ
আমায় দিয়ে ঠেস
ভালোবাসার মানুষ আমার
দুনিয়ায় রইল না আর...

একটা ছোকরা ঝোলায় কয়েক ডজন পাপড়ের প্যাকেট পুরে দৌড়চ্ছিল— একটু হোঁচট খেতেই একটা প্যাকেট ঝোলা থেকে পড়ে গেল। নিচু হয়ে যেই কুড়োতে যাবে, একজন লোক— যার মাথায় ছিল একটা সেলাইকল, বোঝাই যায় চুরির মাল— বলে ওঠে, 'ছেড়ে দে খোকা, ছেড়ে দে... গরম রাস্তায় পড়ে পাপড় এমনিই মুচমুচে হয়ে উঠবে।'

বাজারের রাস্তায় ধপ করে একটা ভারী বস্তা এসে পড়ল। এক মক্কেল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একটা ছুরি দিয়ে ওটাকে চিরে ফেলল, ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গের বদলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চিনি সদা, মিহি-দানার চিনি। ভীড় জমে গেল আর লোকেরা নিজের নিজের ঝুলি ভরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওখানে একজন ছিল যার কোনো কুর্তা ছিল না। সময় নষ্ট না করে সে কোমরের একফালি কাপড়টুকুও খুলে নিয়ে চিনি ভরতে লাগল ওর সেই পুঁটুলিতে।

'সরো... সরো', বলতে বলতে দামী কাঠের ঝকঝকে আসবাব বোঝাই একটা টাঙ্গা চলে গেল।

রাস্তার ধারের একটা বাড়ির জানালা থেকে একটা মসলিনের টুকরো বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া হল। আগুনের শিখা তাকে ছুঁয়ে ফেলল। মাটিতে যখন পৌঁছল সেটা তখন নেহাৎ এক ছাইয়ের টুকরো।

প্যাঁ... প্যাঁ, মোটরগাড়ির হর্নের সঙ্গে দুই মহিলার তীক্ষ্ণ স্বরও মিশে গেল।

দশ পনেরোজন লোক মিলে একটা লোহার সিন্দুক ঘর থেকে টেনে আনল রাস্তায় আর হাতে লাঠি দিয়ে সেটাকে খুলতে পারল।

একটা দোকান থেকে কাউ অ্যাণ্ড গোট-মার্কা শুকনো দুধের কয়েকটা টিনে হাতের ওপর চাপিয়ে আর থুতনি দিয়ে সামলাতে সামলাতে একজন লোক বেরিয়ে এল। তারপর শান্তভাবে ধীরপায়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল।

'গরম পড়ে গেছে। আসুন, লেমনেড খেয়ে দেখুন।' জোরগলায় বলল কেউ। গলায় মোটরগাড়ির টায়ার ঝোলানো একজন এগিয়ে এসে দুটো বোতল তুলে নিল, আর কাউকে ধন্যবাদটুকুও না দিয়ে চলে গেল।

আর একজন চিৎকার করল, 'দমকল ডাকুন; নইলে সমস্ত জিনিস আগুনে পুড়ে যাবে।' কিন্তু, এই সুচিন্তিত পরামর্শ কারো কানেই গেল না।

এমনিতেই লুঠতরাজের বাজার সারাটা দিন গরম ছিল, তার ওপর চারিদিকে জ্বলতে থাকা আগুনের লেলিহান শিখা সেই গরমকে আরো বাড়িয়ে দিল।

অনেকক্ষণ পরে খড় খড় করে শব্দ শোনা গেল— গুলি চালানোর আওয়াজ। পুলিশ আসতে আসতে রাস্তাঘাট শুনশান... একটু দূরে ধোঁয়ায় ধোঁয়া মোড়ের কাছে ছায়ামূর্তি। পুলিশেরা হুইসল বাজাতে বাজাতে ছুটল সেই দিকে। প্রেতমূর্তি দ্রুত ধোঁয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল। সিপাইরা অবশ্য তার পিছন ছাড়ত না। ধোঁয়ায় ঢাকা এলাকা পার হয়ে বোঝা গেল লোকটা একজন কাশ্মীরি শ্রমিক পিঠে একটা বিশাল চটের বস্তা নিয়ে দৌড়চ্ছে। পুলিশরা হুইসল বাজিয়ে বাজিয়ে হয়রান হলেও সে থামেনি। পিঠে তার ভারী বস্তা, ওজন নেহাৎ কম ছিল না, অথচ এমনভাবে সে দৌড়াচ্ছিল যেন সে পিঠে কিছুই নেই।

পুলিশরা হাঁপাতে থাকে। প্রায় রেগে গিয়েই তাদের একজন নিজের রিভলবারটি টেনে গুলি চালিয়ে দেয়। গুলি গিয়ে লাগে কাশ্মীরি শ্রমিকের পায়ে। তার পিঠ থেকে বস্তাটা পড়ে যায়।

ঘাবড়ে গিয়ে সে তার পিছু নেওয়া পুলিশদের দেখল। পায়ের ক্ষত চুঁইয়ে পড়া রক্তও তার চোখে পড়ল। তবুও এক ঝটকায় চটের বস্তাটা টেনে পিঠে তুলে নেয় সে, আর খোঁড়াতে খোঁড়াতেই দৌড় লাগায়।

'জাহান্নামে যাক শালা', হাঁপিয়ে যাওয়া পুলিশরা বলে ওঠে। আর ঠিক তখনই লোকটা হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল, আর বস্তাটা পড়ল তার ওপরে।

এবারে হাঁপিয়ে যাওয়া পুলিশরা লোকটিকে কব্জা করল, আর বস্তাটা তার পিঠে চাপিয়ে থানার দিকে রওনা হল। পথে,

বারবার সে পুলিশদের বলেছিল, 'মহামান্য, আপনারা আমাকে কেন ধরলেন...আমি তো গরীব মানুষ...এক বস্তা চালই তো নিয়েছি...বাড়ীতে খাওয়ার জন্য...মিছিমিছিই আমাকে গুলি মারলেন...'

কিন্তু ওর কোনো কথাই শোনা হল না।

থানায় পৌঁছেও লোকটি সাফাই দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল: 'মহামান্য, অন্য লোকেরা বড় বড় জিনিস চুরি করে,...আমি তো নিয়েছি এক বস্তা চাল...মহামান্য, আমি খুব গরীব, রোজ শুধু ভাতই খাই...'

শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে লোকটা হাল ছেড়ে দিল। মাথার নোংরা টুপিটা দিয়ে ঘাম মুছে নিল, আর চালের বস্তাটার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে, পুলিশ ইন্সপেক্টরের সামনে দু'হাত ছড়িয়ে বলল সে, 'ঠিক আছে, মহামান্য, আপনি বস্তাটা রাখুন...আমি শুধু এই বস্তাটা বয়ে আনার মজুরিটুকুই চাইছি...চার...আনা!'

[মূল রচনা: মজদুরি]

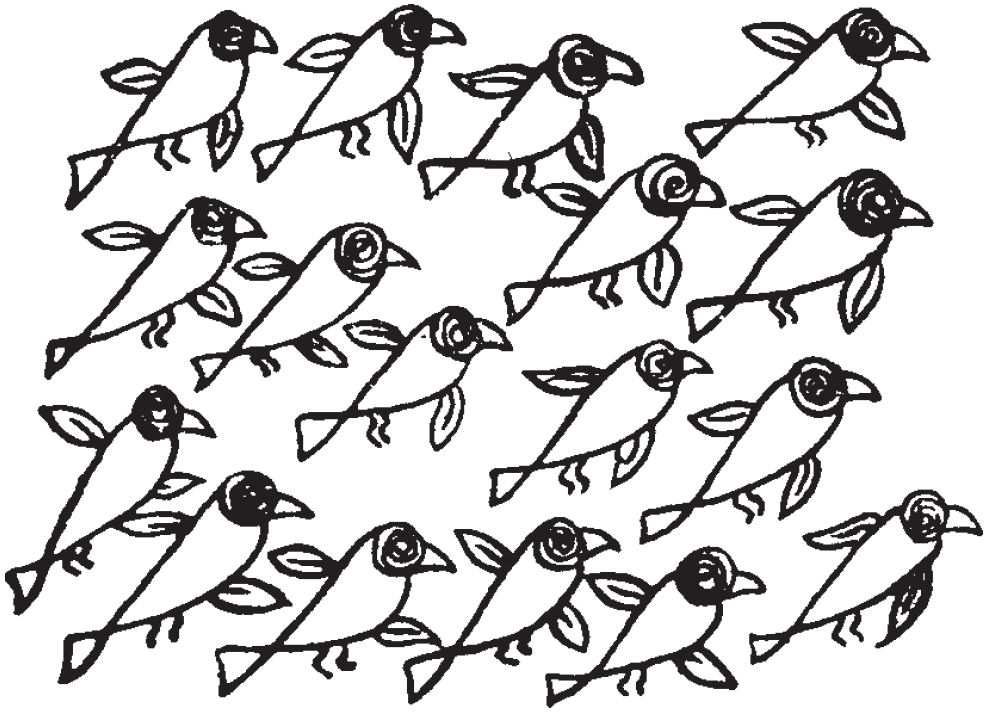

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

Issue date 16 June 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 7 Arek Rakam

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY ACTIVITY COMMUNITY SPIRITUALITY

Yoga & meditation

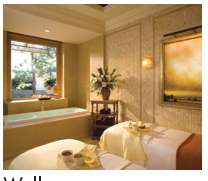
Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

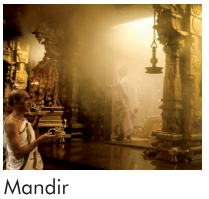
Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503
contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.

Rs. 30